The Disasters Darwinism Brought to Humanity

By

HARUN YAHYA

ডারউইনবাদ ঃ বিশ্ব মানবতার অভিশাপ

অনুবাদ- এ এন এম এ মোমিন

সূচী পত্র

ভুমিকা ঃ বিংশ শতকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

ডারউইনবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ডারউইনের বর্ণবাদ ও উপনিবেশবাদ ডারউইনবাদের সাথে ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ মিত্রতা।

ডারউইনবাদ কমিউনিজম বর্বরতার উৎস ও ভিত্তি।

পুঁজিবাদ ও অর্থনীতিতে যোগ্যতামদের টিকে থাকার সংগ্রাম।

নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসে ডারউইনবাদ।

উপসংহার ঃ ডারউইনবাদী বিষবাষ্প অবশ্যই নিষ্কাশন করতে হবে।

পরিশিষ্ট ঃ বিবর্তনবাদের বিভ্রান্ত/ভূল ধারনা।

ডারউইনবাদ ঃ বিশ্বমানবতার অভিশাপ

ভূমিকা ঃ বিংশ শতকের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী

আমরা সম্প্রতি যুদ্ধ ও সংঘাতময় বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি যা বিশ্ব মানবতাকে দিয়েছে দুঃখ বেদনা, গণহত্যা, দারিদ্র আর সীমাহীন ধ্বংস যজ্ঞ। লক্ষ লক্ষ লোক নিহত ও বেপরোয়া হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। অগনিত লোক ক্ষুধায় ধুকে ধুকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বহু জনগোষ্ঠি গৃহ, আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন হযেছে। ভরণপোষন থেকে বঞ্চিত হয়ে সার্বিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান। লক্ষ লক্ষ মানুষকে এমন অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে যে, কোন পশুকেও এমন ধরনের নির্যাতন করা হয় না। আর এ সব কিছুই করা হয়েছে একটি বিভ্রান্তিকর ও ভ্রষ্ট মতাদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি নির্যাতন ও দুর্ভোগের জন্য কোন না কোন স্বৈরশাসক বা একনায়ক বা স্বেচ্ছাচারী শাসকদের উপস্থিতি লক্ষনীয়। লেনিন, ষ্টালিন, ট্রটস্কি, মাওসেতুং, পলপট, হিটলার, মুসোলিনী, ফ্রাংকো, ইত্যাদি। এদের অনেকেই একই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কেহ কেহ প্রতিপক্ষের মৃত্যু না দেখা পর্যন্ত তাদের বিরোধীতা করা থেকে বিরত হতেন না। এ সমস্ত কর্মকান্ডের মূলে রয়েছে পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ। এ সমস্ত স্বৈরশাসক তাদের সমাজকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পথে নিয়ে গেছেন এবং ভাইকে ভাই এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে দেন। ফলে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। আর ঘটে বোমাবাজি, অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে গাড়ী, যানবাহন, বাড়ীঘর, দোকানপাট ধ্বংসের ঘটনা এবং আক্রমনাত্মক ও সহিংস মিছিল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এ সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী নিষ্ঠুরভাবে -নির্বিচারে শিশু, কিশোর, যুবক মহিলা ও বৃদ্ধকে মারপিট করে এবং যারাই এদের বিরোধীতা করে তাদেরকেই হত্যা করে। তারা এমন হৃদয়হীন ও পাষন্ড যে, এরা একজন নিরীহ লোকের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিনা দ্বিধায় হত্যা করে। এ সব সন্ত্রাসীরা নিরীহ মানুষের মগজ পদদলিত করতে দ্বিধা করে না। তারা নিরীহ জনসাধারণকে বাড়ী থেকে বহিস্কার করে তা তিনি বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু যেই হোন না কেন। এ সব নির্যাতিত মানুষের একমাত্র অপরাধ ছিল অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী।

বিংশ শতাব্দীর দুস্বপ্নের বিভীষিকা থেকে আমরা উঠে এসেছি। মানব জাতিকে দুঃসহ বেদনা ও রক্তের বন্যায় বইয়ে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র বিভ্রান্তিকর একটি মতাদর্শে বিশ্বাস ও তা বাস্তবায়ন করার নামে। ফ্যাসিজিম ও কমিউনিজম এ দুটি মতাদর্শকেই মানব জাতির বিপর্যয় ও দুঃখ কষ্টের কালো অধ্যায় সৃষ্টির জন্য শীর্ষ মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মতবাদ দুটি একটি অপরটির ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় অব্যাহত ছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো দুটি আদর্শই একটি মাত্র উৎস থেকে তাদের পুষ্টি, শক্তি ও সহযোগীতা প্রাপ্ত হয়েছে। আর এই উৎস তথা মতাদর্শ মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না বরং সবসময়ই একটি নিষ্পাপ/নিরীহ তত্ত্ব/মতাদর্শ/ধারনা/মতবাদ হিসাবে

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই উৎস তথা মতবাদ হলো ঃ বস্তুবাদী দর্শন এবং ডারউইনবাদ তথা প্রকৃতিবাদ।

অপেশাদার জীব বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন উনবিংশ শতাব্দীতে সুমেরীয় ও প্রাচীন গ্রীসের পৌরানিক গল্প কথা পুনর্ব্যক্ত করার মাধ্যমে ডারউইনবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেন। আর এর ভিত্তিতে যতগুলি মতবাদের ভিত্তি ভুমি রচিত হয়েছে সবগুলো মানবতার জন্য অভিশাপ হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। ডারউইনবাদ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মুখোশ ধারন করে এসব ভ্রান্ত মতাদর্শ ও এদের অনুসারীদের তখন থেকে এক ধরনের মিথ্যা বৈধতা দান করেছে। এই মিথ্যা বৈধতার বদৌলতে বিবর্তনবাদ তথা ডারউইনবাদ অল্পদিনের মধ্যে জীব বিজ্ঞান ও জীবাশ্ম বিজ্ঞানের অধিক্ষেত্র অতিক্রম করে মানব সম্পর্ক থেকে শুরু করে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও মানুষের সার্বিক জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিস্তার করে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব মতবাদ বা চিন্তাধারা সমাজকে প্রভাবিত করেছিল এর কয়েকটি চিন্তার স্রোতধারা ডারউইনবাদের তত্ত্বের মধ্যে তাদের যৌক্তিকতা বা তথাকথিত প্রমান খুঁজে পেল। ফলে ডারউইনবাদে এ সকল চিন্তাধারা বা মতবাদের ব্যাপক সমর্থন পেতে সক্ষম হলো। অস্তিত্বের সংগ্রাম ‘‘ সবলই বেঁচে থাকে ’’ অন্যরা ধ্বংসপ্রাপ্ত/পরাজিত হয়ে ‘‘সমাজ থেকে অদৃশ্য তথা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় প্রভৃতি মতবাদ মানবীয় চিন্তা চেতনায় অনুপ্রবেশ করে এবং তা লালনের মাধ্যমে মানব সমাজে প্রয়োগ করতে শুরু করে। ডারউইনবাদ যখন দাবী করতে থাকে যে, ‘‘ অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ’’ ও দ্বন্দ্ব ‘‘একটি প্রাকৃতিক বিধান এবং যা শুধুমাত্র উদ্ভিদ ও প্রানী জগতে নয় বরং তা সার্বিকভাবে মানব সমাজের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। এই নীতিরই ধারাবাহিকতার আলোকে হিটলার এর বিকৃত চিন্তাধারায় জার্মান জাতিকে ‘‘প্রভুর জাতি’’ কার্ল মাকর্স এর দাবী ‘‘ মানব জাতির ইতিহাস শ্রেনী সংগ্রামের ইতিহাস’’ এবং পুঁজিপতিদের নীতিতে ধনীরা গরীবদের ‘‘বঞ্চনা তথা শোষনের ’’ মাধ্যমে ‘‘ধনী অধিকতর ধনী হবে’’ উপনিবেশবাদীদের তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের জনগনকে শোষন ও বঞ্চনার মাধ্যমে অধিনস্ত রাখার সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রবর্তনের দ্বারা বর্নবাদী আক্রমন, নিগ্রহ, প্রবঞ্চনা, বৈষম্য ও অপশাসনের তাত্বিক যৌক্তিকতা পাওয়া যায়।

রবার্ট রাইট **(Robert Wright)** একজন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্বেও তার বই **The Moral Animal**-এ মানব জাতিকে বিবর্তনবাদ কিভাবে এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে তা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ননা করেছেন ঃ ‘‘ বিবর্তনবাদ প্রকৃত পক্ষে মানবীয় কর্মকান্ডের ইতিহাসে একটি দীর্ঘ ও নীতিজ্ঞানহীন অপপ্রয়োগ। এই শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনৈতিক মতবাদের সাথে মিলেমিশে একটি অবোধ্য রাজনৈতিক মতবাদ সৃষ্টি করে এটি ‘‘সামাজিক ডারউইনবাদ’’ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং তখন থেকেই এই জঘন্য মতবাদ, বর্নবাদী, ফ্যাসিবাদী ও সবচেয়ে হৃদয়হীন পুঁজিপতিদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ’’

এই পুস্তকে যে তত্ত্ব, তথ্য ও প্রমানাদি উপস্থাপন করা হয়েছে তার মাধ্যমে জানা যায় যে, ডারউইনবাদ শুধুমাত্র জীবের উৎপত্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে এর বক্তব্য সীমিত রাখেনা বরং ডারউইনবাদ একটি গোঁড়া মতবাদ যা ধর্মীয় বিশ্বাসের মত এর অনুসারীদের মধ্যে এক ধরনের অন্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যদিও ডারউইনবাদ সম্পূর্নভাবে ভুল প্রমানিত হয়েছে।

তবুও বহু বিজ্ঞানী , রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদ ডারউইনবাদের অন্ধকার দিক অর্থাৎ এর বিভ্রান্তি জেনে বা না জেনেও এই গোঁড়া ও বিভ্রান্তিকর মতবাদকে এখন পর্যন্ত সমর্থন দিয়ে আসছেন। যদি সমাজের আপামর জনগন এই অবৈজ্ঞানিক মতবাদের ভুল ত্রুটি ও সামাজিক ক্ষতি তথা সার্বিক বিপর্যয় সর্ম্পকে সঠিকভাবে জানতে পারেন তা হলে স্বৈরশাসক, নির্দয় ও অমানবিক স্বার্থপর ব্যক্তিদের এ মতবাদ কার্যকরী করার সুযোগ থাকবেনা। ফলে এই বিভ্রান্তিকর মতবাদের অপপ্রয়োগ সমাজ থেকে নির্মুল করা সম্ভব হবে। ডারউইনবাদের অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে যারা মানব সমাজে অশান্তি, বিশৃংখলা, শোষণ, বঞ্চনা ও স্বার্থপর চিন্তাধারা ও মতাদর্শ প্রচার, প্রসার ও প্রয়োগ করে বলেন যে, এটাই ''প্রাকৃতিক বিধান''। তখন এটা বলার আর কোন সুযোগ থাকবেনা বা সমাজে তা গৃহীত হবেনা।

মানবতা বিরোধী সকল মতাদর্শের মূল ডারউইনবাদ যদি সম্পূর্নরুপে সমাজ থেকে চুড়ান্তভাবে উৎপাটিত হয় সে ক্ষেত্রে একটি মাত্র সত্য বিদ্যমান থাকবে। সেই মহাসত্য হলো ঃ ''এই বিশ্ব ভ্রমান্ড ও মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যে সকল ব্যক্তিবর্গ এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন তারা এও বুঝতে পারবেন যে প্রকৃত বাস্তব সত্য হলো মানব জাতির সকল সমস্যা সমাধানের উপায় ও পন্থা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ঐশী গ্রন্থেই নিহিত আছে।'' ব্যাপক জনগোষ্ঠি যদি এই ধারনা পোষণ করে তবে বিশ্ব সমাজ থেকে দুঃখ, বেদনা, অন্যায়, অবিচার, দুর্ভোগ দুর্দশা, গণহত্যা ও দারিদ্র অপসারিত হবে এবং এর পরিবর্তে প্রজ্ঞা, ধন সম্পদ, সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য ও মুক্তি মানব সমাজে বিরাজ করবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন সকল মিথ্যা ও মানব জাতির জন্য ক্ষতিকারক মতবাদ সমাজ থেকে অপসৃত হবে এবং শুধু সেই পবিত্র ও ঐশী মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে প্রকৃত জনকল্যান সাধন করা সম্ভব হবে। ''ঢিল মারলে পাটকেল ছোঁড়া'' বা ''ঘুসির বদলে ঘুসি মারা'' অথবা আক্রমনকারীকে অধিকতর বড় আঘাত দিয়ে কোন সমস্যার বাস্তব সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের কাছে ধৈর্য্য, দয়া ও সহানুভুতির সাথে প্রকৃত সত্য বিস্তারিতভাবে বর্ননার মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারা বা ধ্যান ধারনা পরিবর্তন করানোর মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

এই পুস্তক লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যারা ডারউইনবাদের অন্ধকারময় দিক জেনে অথবা না জেনে এতে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে থাকেন, তাদেরকে এ মর্মে অবহিত করা যে, তারা প্রকৃতপক্ষে কোন মতবাদকে সমর্থন করছেন। আর যারা এই মতবাদকে বিশ্বাস করেন না ঠিকই, তবে তারা ডারউইনবাদকে বিশ্ব মানবতার জন্য হুমকি স্বরুপ বলেও মনে করেন না, তাদের ডারউইনবাদের অন্ধকার দিক সম্পর্কে সর্তক করাও এ পুস্তকে লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রথম অধ্যায়

ডারউইনবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিশ্বমানবতার দুঃখ দুর্দশা ও বিপর্যয়ে ডারউইনবাদের ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনার পুর্বে এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকের ধারনা যে, চালর্স ডারউইন সর্বপ্রথম বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক প্রমান, পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই মতবাদ প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদের মূল প্রবক্তা ডারউইন নয়। তাই এ মতবাদের উৎসে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমান নাই।

প্রাচীন মেসোপোটামিয়ায় যখন প্রতিমা পুজা ভিত্তিক ধর্মীয় বিশ্বাস চালু ছিল তখন পৃথিবীতে প্রানের আবির্ভাব, বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিভিন্ন কুসংস্কার ও পৌরানিক কল্প কথা প্রচলিত ছিল। এ সকল ধারনার মধ্যে একটি বিশ্বাস বা মতবাদ ছিল বিবর্তনবাদ। এনুমো-ইলিশ **(ENUMA -ELISH)** কাব্যে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয় যে, এক প্রলয়ংকরী বন্যার পর অকস্মাৎ দুই দেবতা লাহমা **(LAHMA)** ও লাহমু **(LAHAMU)** এর আর্বিভাব ঘটে। এই মতবাদের মূল ধারনা হচ্ছে ঃ ‘‘এক দেব মূর্তি (দেবতা) সর্বপ্রথম নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন পদার্থ এবং অন্যান্য জীব সৃষ্টি করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।’’ অন্য কথায় সুমেরীয় পৌরানিক কল্পকথা অনুযায়ী অজৈব জলজ আকারহীন অবস্থা হতে হঠাৎ পৃথিবীতে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রানের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়।

এই পর্যালোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সুমেরীয়দের এই ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থাৎ পৃথিবীতে অজৈব পদার্থ থেকে প্রানের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে যা চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ন। এতে প্রমানিত হয় যে, বিবর্তনবাদের প্রথম প্রবক্তা ডারউইন নন বরং তা সুমেরীয় প্রতিমা পূজারীদের ধর্মীয় বিশ্বাস। পরবর্তীতে অপর একটি প্রতিমা পূজারী সভ্যতা অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীসে এই বিবতর্নবাদের প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটে। প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দার্শনিকগন তাদের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জড়বস্তু ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব বিশ্ব সৃষ্টিতে বিদ্যমান তা বিশ্বাস করতেন না। এই সকল গ্রীক দার্শনিক বিবর্তনবাদের পৌরানিক কল্পকাহিনীকে সুমেরীয় সভ্যতার উত্তরাধিকার হিসাবে আত্মস্হ করে বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এভাবে বস্তুবাদী দর্শন ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত পৌরানিক কাহিনী প্রাচীন গ্রীসে আমদানী করা হয়। প্রাচীন গ্রীস থেকে এই মতবাদ পরবর্তীতে রোমান সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতকে এই উভয় মতবাদ পুনরায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যা মূলতঃ প্রতিমা পূজারী সংস্কৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত। কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় চিন্তাবিদ, যারা গ্রীক দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন।তারা জড়বাদী তথা বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সকল চিন্তাবিদদের মধ্যে এক গভীর মিল ছিল তা হলো- ধর্মের সংগে বিরোধীতা তথা নাস্তিকতা বা নাস্তিক্যবাদ।

ফরাসী জীববিজ্ঞানী জা ব্যাপটিস্ট লেমার্ক **(Jean Baptiste Lamarck)** প্রথম ব্যক্তি যিনি বিবতর্নবাদ নিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষনা করেন। লেমার্ক ধারনা করতেন যে, সকল প্রকার প্রানী সামান্য পরিবর্তিতরুপে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রুপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারন করেছে। এই মতবাদ পরবর্তীতে মিথ্যা হিসাবে প্রমানিত হয়। তা সত্ত্বেও লেমার্কের এই মতবাদ কিছুটা পরিবর্তিতরুপে যে ব্যক্তি বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করেন তিনি হলেন বৃটিশ সখের জীব বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন।

১৮৫৯ সালে ইংল্যান্ডে চার্লস ডারউইন তাঁর পুস্তক দি অরজিন অব স্পেসিস **(The origin of Species)** এর মাধ্যমে এই মতবাদ উপস্থাপন করেন। এই পুস্তকে বিবর্তনবাদের সুমেরীয় সভ্যতার পৌরানিক কথা একটু বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন। তিনি দাবী করেন যে সকল প্রানী দৈবাৎ পানি থেকে এবং এক পুর্ব পুরুষ **Common Ancestor** থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই সকল প্রানী স্বতস্ফুর্তভাবে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে এক থেকে অন্য প্রানীতে রুপান্তরিত হয়েছে।

চার্লস ডারউইনের এই দাবী তার সময়কার বিজ্ঞানীদের সাধারণ অনুমোদন বা গ্রহনযোগ্যতা লাভ করতে অসমর্থ হয়। বিশেষ করে ফসিল (জীবাশ্ম) বিশেষজ্ঞগন অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ডারউইনের দাবী একটি কষ্ঠ কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও সময়ের আবর্তনে ডারউইনের মতবাদ সমাজের বিভিন্ন গ্রুপের সমর্থন পেতে থাকে। এ সমর্থনের অন্যতম কারন হলো উনবিংশ শতাব্দীর শাসকগোষ্ঠি ডারউইন ও তার এই মতবাদে ভিতর তাদের অবৈধ শাসন ও শোষন পাকাপোক্ত করার হারানো সূত্র খুঁজে পেয়েছেন।

<u>মতাদর্শগত কারনে ডারউইনবাদের সমর্থন</u>

ডারউইনের পুস্তক দি অরজিন অব স্পেসিস(১৮৫৯) যখন প্রকাশিত হয় তখন বিজ্ঞান অত্যন্ত পশ্চাদপদ অবস্থায় ছিল। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, সেকেলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে জীব কোষ **(cell)** সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের ছিল। অর্থাৎ তা একটি বিন্দুর **(Blot)** মত এবং এর অতিরিক্ত কিছু জানা সম্ভব ছিলনা। বর্তমানে আমরা জানি যে, এই প্রান কোষ একটি অতি জটিল নিয়মবদ্ধ পদ্ধতি **(System)** এ কারনে সেই সময়ে অজৈব পদার্থ থেকে দৈবাৎ প্রানের সুচনা হয়েছে মর্মে ডারউইনের এ দাবী প্রচার করতে কোন সমস্যা দেখা যায় নি। অনুরূপভাবে জীবাশ্ম গবেষণাও অনুন্নত পর্যায়ে থাকায় সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে মর্মে দাবী করাও সম্ভব হয়েছিল।অথচ বর্তমানে এমন একটিও জীবাশ্ম রেকর্ড নাই যার সাহায্যে প্রমান করা সম্ভব যে, প্রাণী স্বতস্ফূর্তভাবে একটি থেকে অন্যটিতে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে তথা সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কিছুদিন পুর্বেও বিবর্তনবাদীরা এই বিতর্কে অবতীর্ন হয়ে বলতেন ‘‘ আধা মানব -আধা প্রানী ভবিষ্যতে কোন দিন দেখা যাবে’’ বর্তমানে তারা এটা আর কোন ক্রমেই গোপন করতে পারছে না যে, এ দাবীটি আদৌ সত্য নয় । (বিবর্তনবাদের বিভ্রান্তি অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখিত)

এ ধরনের প্রত্যক্ষ প্রমান থাকা সত্ত্বেও ডারউইনবাদীরা তাদের মতবাদ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন। ডারউইনবাদীরা বিগত ১৫০ বৎসর যাবৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের ন্যায় এই মতবাদ বিশ্বস্তার সাথে অনুসরণ করে আসছেন। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষনায় ডারউইনবাদ ভ্রান্ত প্রমানিত হওয়া

সত্ত্বেও এ মতবাদের সমর্থনকারীগন জোর প্রচারনা চালিয়ে আসছেন। ডারউইনবাদের অস্তিত্ব এ কারনেই কোন না কোন গোষ্ঠির মধ্যে টিকে আছে।

ডারউইনবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ দিক হচ্ছে এ মতবাদে সৃষ্টিকর্তার অস্বীকৃতি। বিবর্তনবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী পদার্থ থেকে দৈবাৎ জীবনের উদ্ভব হয়েছে। ডারউইনের এই মিথ্যা দাবী জড়বাদী বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে সকল নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক মতবাদের মিথ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করে। এর কারন হলো উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞানকে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে অনুসন্ধান, গবেষণা ও তার বিভিন্ন গুনাগুন তথা বৈশিষ্ট আবিষ্কার করার পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করতেন। এ ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির কারনে নাস্তিক ও জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগন তাদের মতবাদ প্রচার, প্রসার ও বিকাশের কোন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ডারউইনবাদে স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকৃতি তাদের চিন্তাধারা প্রমানের জন্য এক ধরনের ভ্রমাত্মক সমর্থন ও সুযোগ সৃষ্টি করে। এ কারনেই জড়বাদী ও নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী ডারউইনবাদকে তাদের নিজস্ব মতাদর্শ হিসাবে গ্রহন করেন। ডারউইনবাদে স্রষ্টার অস্বীকৃতির সাথে সাথে প্রানের বিকাশ ও প্রকৃতিতে ‘‘ জীবের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামকে ’’ এক সূত্রে গাঁথা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।’’ এ ‘‘সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী বিজয়ী হয় ’’ এবং ‘‘দূর্বল পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।’’ যে সকল জীবন দর্শন মানবজাতির জন্য মহা দুর্ভোগ ও বিপর্যয় নিয়ে এসেছে তাদের সাথে ডারউইনবাদীদের সমর্থন ও সহযোগীতা এ কারনেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

সামাজিক ডারউইনবাদ ঃ মানবীয় চরিত্রে জংলী আইন প্রবর্তন

‘‘ প্রকৃতিতে অস্তিত্বের সংগ্রাম ’’ বিবর্তনবাদের একটি অন্যতম দিক যা এ মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি। ডারউইনের মতে প্রকৃতিতে অস্তিত্বের জন্য নিষ্ঠুর সংগ্রাম সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সংঘাত একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। এ সংগ্রামে সব সময় শক্তিধর দূর্বলকে পরাজিত করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে। দি অরজিন অব স্পেসিস নামক পুস্তকটির উপ-শিরোনামে বিষয়টি. সংক্ষিপ্তকারে এই ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। **“ The Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Race in the Struggle for Life ”** প্রাকৃতিক নিবার্চন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রজাতি সমূহের উৎপত্তি অথবা জীবন সংগ্রামে আনুকুল্য প্রাপ্ত প্রজাতি সমূহের সংরক্ষন।

বৃটিশ অর্থনীতিবিদ টমাস মালথাস **(Thomas Malthus)** এর **An Essay on the Principle of population** পুস্তকটি ছিল ডারউইনের এ মতবাদের প্রধান উৎসাহ দাতা। এই পুস্তকে মানব জাতির জন্য একটি ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইংগিত ছিল। মালথাস হিসাব করে দেখালেন যে, জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং ২৫ বৎসরে তা দ্বিগুন হয় কিন্তু খাদ্য সরবরাহ কোনক্রমেই এই হারে বৃদ্ধি পায় না। ফলে মানবজাতিকে অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের স্বাভাবিক উপাদান হলো যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। অর্থাৎ কিছু লোককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অন্যদের মরতে হবে। আস্তিত্ব বা টিকে থাকার অর্থই হচ্ছে চিরস্থায়ী যুদ্ধ। ডারডইন নিজেই বলেছেন

যে, মালথাসের পুস্তকে ''অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'' সর্ম্পকীয় মতবাদ তাকে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখায়। তিনি লিখেছেন, ''১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ আমার পদ্ধতিগত অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ১৫ মাস পর হঠাৎ আমি জনসংখ্যার উপর লেখা মালথাসের বইটি পড়ে জানতে পারি যে, দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, প্রানী ও উদ্ভিদ জগতে সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকে থাকার মতবাদ নির্ধারন করা আছে। এরই সুত্র ধরে হঠাৎ আমার বোধোদয় হয় যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে (অস্তিত্বের সংগ্রাম) আনুকুল্য প্রাপ্ত প্রজাতি বিজয়ী হয় অর্থাৎ টিকে থাকে, প্রতিকুল পরিবেশে সংগ্রামরত প্রজাতি পরাজিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। অবশেষে এই পুস্তকেই আমি একটি বিবর্তনবাদী তত্ত্ব তথা কার্যকরী মতবাদের সন্ধান পাই।''

উনবিংশ শতাব্দীতে মালথাসের এ তত্ত্ব যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ইউরোপের অভিজাত বুদ্ধিজীবিগন বিশেষভাবে এ মতবাদের সমর্থন যোগান। উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় চিন্তাবিদগন মালথাসের জনসংখ্যা সমস্যা সংক্রান্ত মতবাদের যে গুরুত্ব প্রদান করেন তা **The Scientific Background of the Nazi '' Race Purification ''** নাজীদের প্রজাতি পরিশুদ্ধকরন কর্মসুচীর বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র ইউরোপে শাসক শ্রেনীর ব্যাক্তিবর্গ সদ্য উদ্ভাবিত মালথাসের '' জনসংখ্যা সমস্যা '' সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর শাসক শ্রেনী মালথাসের মতবাদ বাস্তবায়ন করার কর্মসূচী গ্রহন করেন। এর আওতায় দরিদ্রের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠির পরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পরিবর্তে আমরা বরং বিপরীত পন্থাই গ্রহন করবো। আমাদের শহরগুলিতে অপ্রশস্তকর রাস্তা নির্মান, ছোট ছোট বাসগৃহে বহু লোক থাকার ব্যবস্থা করব। ফলে এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যাতে প্লেগের আক্রমন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আমাদের পল্লী এলাকাগুলো পানিবদ্ধ এলাকায় নির্মান করবো এবং স্যাঁতস্যাঁতে ও ক্ষতিকর পরিবেশে জনবসতি স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করবো ইত্যাদি ফলে দারিদ্র হঠানোর চেয়ে দরিদ্রদের মৃত্যুর মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়। এই নিষ্ঠুর নীতি অনুসরনের মাধ্যমে অর্থাৎ অস্তিত্বের সংগ্রামে শক্তিধর বিজয়ী ও দূর্বল পরাস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও বর্ধনশীল জনসংখ্যার সমতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে এই নিষ্ঠুর ''গরীব নিধন '' কর্মসূচী প্রকৃতপক্ষেই বাস্তবায়ন করা হয়। এর আওতায় একটি শিল্পায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে ৮/৯ বছরের শিশু শ্রমিকদের ১৬ ঘন্টা কয়লার খনির অমানবিক পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করা হতো এবং এ প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার শিশু নিধন করা হয়। ''অস্তিত্বের সংগ্রামের'' তাত্ত্বিক ভিত্তি যা মালথাস দিয়েছিলেন এরই ধারাবাহিকতায় ইংল্যান্ডে লক্ষ লক্ষ গরীব জনগোষ্ঠি মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

ডারউইন, মালথাসের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধারনা করলেন যে, সমগ্র প্রকৃতিতে এই ধারাই বিরাজমান। কাজেই মানব সমাজেও এ ধারা প্রয়োগ করা উচিত। এটা হলো- ''শক্তিশালী যোগ্যতরের বিজয় ও দূর্বলের পরাজয় ও ধ্বংস '' তিনি বিশেষভাবে এর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এটা অলংঘনীয় ও চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে তিনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকৃতির মাধ্যমে তিনি জনসাধারনের ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিতে উৎসাহিত করেন কারন এগুলো হলো

তার ''অস্তিত্বের সংগ্রাম'' মতবাদের নিষ্ঠুর প্রয়োগ পদ্ধতির পরিপন্থি। এ কারনেই ডারউইনের মতবাদ তখন থেকেই শাসক শ্রেনীর পূর্ন সমর্থন লাভ করে। সর্বপ্রথম যা ইংল্যান্ডে ও পরবর্তীতে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে।

সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিপতি ও অন্যান্য বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবিগন এই মতবাদকে স্বাগত জানান। কারন ইতোমধ্যে তারা যে ভারসাম্য ও নীতিহীন শোষন ভিত্তিক রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। এ মতবাদের মধ্যেই তার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা দেখতে পেয়েছিলেন। এই কারনে তারা এ মতাদর্শ অনতিবিলম্বে গ্রহন করে এর বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

বিবর্তনবাদ অচিরেই সমাজের সকল স্তরে অনুপ্রবেশ করে। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি অর্থাৎ সমাজে এমন কোন বিষয় রইল না যা এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা শ্লোগান হলো '' অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম '' ও ''যোগ্যতমের টিকে থাকা।''_রাজনৈতিক দল, জাতি, দেশ, প্রশাসন, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সমাজের প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি এই আদর্শে অনুপ্রানিত হয় কারন ইতিমধ্যে সমাজে প্রধান নিয়ন্ত্রনকারী মতাদর্শ হিসাবে ডারউইনবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বা অন্য কথায়, সমাজের সকল চিন্তা, চেতনা, ভাবধারায় ডারউইনবাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে যায়। এমনকি চিত্রকলা, রাজনীতি, ইতিহাস এ সকল ক্ষেত্রও ডারউইনী মতাদর্শের আওতা বহির্ভুত থাকল না।

ডারউইনবাদের সাথে প্রতিটি বিষয়ের সম্পর্ক স্হাপন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ডারউইনবাদী দৃষ্টিকোন থেকে যে কোন বিষয় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার রীতি/পদ্ধতি চালু করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে এমনকি ডারউইনবাদের নাম না জানা সত্ত্বেও ডারউইনী মতাদর্শের ভিত্তিতে যে ধরনের সমাজ ব্যবস্হা গড়ে উঠার কথা তাই সমাজে গড়ে উঠে।

ডারউইন নিজেই সুপারিশ করেছিলেন যে, তার মতবাদ (বিবর্তনবাদ) যেন সামাজিক বিজ্ঞানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োগ করা হয়। ১৮৬৯ সালে এইচ থিল **(H. Thiel)** এর নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে ঃ

''প্রজাতিসমূহের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমি যে মতামত প্রকাশ করেছি তা সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেন সমভাবে ব্যবহার না করা হয়। আপনি তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারেন। তিনি আরো বলেন যে, ইতোপূর্বে আমি কোনক্রমেই মনে করি নাই যে, আমার মতামত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে (নৈতিক মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে) এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হবে। ''প্রকৃতির এই সংগ্রাম '' মানবীয় চরিত্র ও কর্মকান্ডে আরোপ করা হয়। ফলে বর্ণবাদ, ফ্যাসীবাদ, কমিউনিজম, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি নামে এ সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে শক্তিধর ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠি, তাদের বিবেচনায় যারা দূর্বল তাদের ধ্বংস করার নতুন হাতিয়ার পেলো। এই ধ্বংস যজ্ঞের তথাকথিত বিজ্ঞান সম্মত তত্ত্ব পাওয়া গেল। এ কারনে বর্তমানে যারা জঘন্য গনহত্যা ও মানুষের সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করে। মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং মানুষের গাত্রবর্ণের কারনে হীন বিবেচনা করে। প্রতিযোগীতার নামে ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়, ধনী হয়েও দরিদ্রদের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয় না, তাদের কার্যকলাপকে নিন্দা করা বা বাধা দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ

তাদের মতে তারা একটি তথাকথিত প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক আইনের আওতায় এ সব নির্বিচারে করছে। এ সকল কর্মকান্ডকে এক কথায় সামাজিক ডারউইনবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হচেছ।

প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী, আমেরিকান জীবাশ্ম বিজ্ঞানী **STEPHEN JAY GOULD** এ সত্য স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন ঃ ১৮৫৯ সালে **The Origin of Species** প্রকাশিত হওয়ার পর দাস প্রথা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্নবাদ, শ্রেনী সংগ্রাম, লিংগ বৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার ‘‘ বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।’’ মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা, জাত্যাভিমান, সংঘাত, বর্বরোচিত কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সব সময় মানব জাতিকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাদের এ সকল কর্মকান্ড অন্যায়, ভুল, এবং তা থেকে বিরত থেকে মানব জাতিকে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। মানব জাতি ঐশী ধর্মের মাধ্যমে অন্তত পক্ষে এটুকু বুঝতে ও জানতে পেরেছিল যে, তাদের এ সকল উৎপীড়নমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া ভুল বা অন্যায় যা নৈতিকতাবিরোধী। উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনবাদের প্রচার ও প্রসারের পর জনমনে এ ধারনা সৃষ্টি হলো লাভ, জুলুম ও অবিচারের জন্য দ্বন্দ্ব সংগ্রাম করার একটি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা রয়েছে। বলা হলো এটা মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের আক্রমনাত্মক ও বর্বরোচিত আচরণ সে তার পূর্ব পুরুষদের(পাশবিক চরিত্র) কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তাই জংগলে যেভাবে সবচেয়ে বলশালী ও আক্রমনাত্মক প্রাণী, সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে, সেই একই আইন মানব সমাজেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ চিন্তাধারার প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ, বিপর্যয়, গণহত্যা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ডারউইনবাদ এ সকল কর্মকান্ডে সমর্থন ও উৎসাহ যোগায়। অর্থাৎ এ মতবাদ সকল প্রকার রক্তপাত, সংঘাত, নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট-কে যৌক্তিক সমর্থন দিয়ে থাকে। এ কারনেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতায় সকল মানবধ্বংসী মতবাদ সমূহ নৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বিংশ শতাব্দীতে ‘‘ এক দুর্ভোগের শতক ’’ হিসাবে আখ্যাযিত. করা হয়।

ইতিহাসের অধ্যাপক **Jacques Barzun** তাঁর বই **DARWIN, MARX, WAGNER** বর্তমান বিশ্বের নৈতিকতার অধঃপতনের কারন অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করেছেন। এ পুস্তকে সমাজে ডারউইনবাদের প্রভাব বর্ননা প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন যে ঃ

১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের যুদ্ধবাজ রাজনৈতিক দল চাচ্ছিল অস্ত্র, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী দল চাচ্ছিল নিষ্ঠুর প্রতিযোগীতা, রাজতন্ত্রবাদী দলের দাবী ছিল অনগ্রসর জনগোষ্ঠির উপর প্রাধান্য বিস্তার, সমাজতান্ত্রিক দলের ছিল দাবী-ক্ষমতা দখল, বর্ণবাদী দলের দাবী বিরোধীদের আভ্যন্তরীন বহিষ্কার/আবসায়ন। এ সকল মতাদর্শীই কোন না কোনভাবে তাদের চিন্তাধারার স্বপক্ষে ডারউইনবাদকে ব্যবহার করেন। ডারউইন ও স্পেনসার বিষয়টি পূর্বেই উপস্থাপন করেছিলেন, এতে বলা হলো যেহেতু কোন বর্নের শ্রেষ্ঠত্ব একটি জীব বিজ্ঞানের বিষয় যেহেতু তা মানব সমাজ সম্পর্কীত তাই এটা সমাজ বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু, এটাই ডারউহনবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন যখন তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে দাবী করলেন যে, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক কোন কিছু সৃষ্টি করা হয় নাই, বরং '' দৈবাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে '' এগুলি বিকাশ লাভ করেছে। মানব জাতি ও পশুকুল এক অভিন্ন পূর্ব পুরুষ থেকে আবির্ভূত হয়ে এবং পরবর্তীতে এক অতি উন্নত প্রজাতি/প্রানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অধিকাংশ লোকই তখন এই দাবীর প্রকৃত কুফল সম্পর্কে ধারনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এই কুফলের ভয়াবহতা সমগ্র পৃথিবীতে ছাড়িয়ে পড়েছে। যারা মানব জাতিকে ''উন্নত পশু'' হিসাবে বিবেচনা করেছে, তারা দূর্বল, অসুস্হ ও তাদের বিবেচনায় ''নীচ '' বলে মনে করেছে তাদের ''হীন প্রানী '' হিসাবে গন্য করে ঘৃনাভবে পদদলিত করেছে। এবং এই তাদের থেকে ''নীচু প্রজাতিকে'' নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে দ্বিধা করে নাই। কারন তাদের তত্ত্বে একটি মুখোশ ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলো '' প্রাকৃতিক আইন।'' এভাবেই ডারউনবাদ বিশ্বে মহাবিপর্যয় নিয়ে এসেছে এবং দ্রুতগতিতে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকগনের চিন্তাধারা ডারউইনবাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতো যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি মানুষসহ সমগ্র প্রানী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য প্রানী থেকে মানুষ্য প্রজাতির একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে কারন মানুষের রয়েছে আত্মা যা সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য সৃষ্টি। মানুষ সে যে বর্নের বা জাতির বা গোত্রেরই হোক না কেন, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ও তার বান্দা বা দাস। ধর্মহীনতা তথা নাস্তিক্যবাদের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ডারউনবাদ বিভিন্ন সামাজিক শ্রেনী সৃষ্টি করে। এরা মানুষ একটি উন্নত প্রজাতির পশু হিসাবে গন্য করতে থাকে এবং একটি নিষ্ঠুর ও প্রতিযোগীতামূলক নিষ্ঠুর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করে সকল কর্মকান্ডে মানবতাবাদী নীতি ও আদর্শ বর্জন করে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি কোন দায়-দায়িত্বের অস্বীকৃতির মাধ্যমে তারা এমন একটি সংস্কৃতি সৃষ্টি করে যেখানে সকল প্রকার স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা যৌক্তিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন মত, পথ ও আদর্শের জন্ম হয় এবং এদের প্রত্যেকটি ''বাদ বা মতাদর্শ '' মানবজাতি তথা পৃথিবীর জন্য এক একটি মহা বিপর্যয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ডারউইনবাদ যে সমস্ত ''মতবাদকে'' সমর্থন দান করেছে এবং এ ধরনের তাত্ত্বিক সমর্থন ও সহযোগীতা কিভাবে বিশ্বমানবতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তার বিস্তারিত বিবরন পরবর্তীতে পর্যালোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডারডইনের ঃ জাতিগত বিদ্বেষ-বর্ণবাদ ও উপনিবেশবাদ

ডারউইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রফেসর **ADAM SEDGWICK** ছিলেন তাদেরই একজন যারা বিবর্তনবাদের ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে পূর্বেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এই পুস্তকটি পাঠ করে এর বিষয়বস্তু অনুধাবন করার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন। ‘‘ এই মতাদর্শ সর্বজনগাহ্য হলে মানব জাতির জন্য এমন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা নিয়ে আসবে যা অতীতে মানুষ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই।’’ ইতিহাস প্রমান করেছে যে **ADAM SEDGWICK** এর ধারনা অমূলক ছিলনা বরং ডারউইনবাদের যুক্তি ও তথাকথিত প্রাকৃতিক আইনের আওতায় যা করেছেন তা ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শুধুমাত্র জাতিগত ও জন্ম তথা বর্ণগত কারনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। ফলে উনবিংশ শতাব্দী হয়েছে অন্ধকার যুগ।

ডারউইনের পূর্বে যদিও জাতিগত বৈষম্য ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু ডারউইনবাদ এ ধরনের বৈষম্যকে একটি মিথ্যা বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব ও অলীক যৌক্তিকতা দান করেছে যা বিশ্বের ইতিহাসে কখনও নৈতিক সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয় নাই।

আনুকূল্য প্রাপ্ত প্রজাতি সমূহ সংরক্ষণ

বর্তমানে অধিকাংশ ডারউইনবাদী দাবী করে থাকেন যে, ডারউইন কখনও বর্ণবাদী ছিলেন না বরং বর্ণবাদীরা তাদের মতবাদকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ডারউইনের মতবাদকে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা আরো দাবী করেন, ডারউইনের পুস্তকে **The Origin of Species** উপ-শিরোনাম **By the preservation of Favoured Races** শুধুমাত্র প্রাণী জগতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এ সব দাবীর প্রবক্তারা প্রকৃতপক্ষে এ পুস্তকে ডারউইন মানব প্রজাতি সম্পর্কে কি মতামত উপস্থাপন করেছেন তা অস্বীকার করছেন বা তা বিবেচনা করেননি।

ডারডইন তার পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, মানব জাতি বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে। কোন কোন মানব প্রজাতি অন্যদের তুলনায় অধিকতর বিকশিত ও অগ্রসর হয়েছে। কোন কোন প্রজাতি বা তাদের পূর্ব পুরুষ মানবদের তুলনায় কিছুটা উন্নত বা অগ্রসর বা অধিকতর বিকশিত। এ প্রজাতির কোন কোনটি আবার বানরের পর্যায় থেকে একটু সামান্য বেশী উন্নত। ’’ডারউইন আরো দাবী করেন যে, (বিভিন্ন মানুষ) প্রজাতির মধ্যে ‘‘ অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ’’ পশুদের ন্যায় সমভাবে প্রযোজ্য। ‘‘ অনূকুল পরিবেশ প্রাপ্ত প্রজাতি ’’ এ সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে থাকে। ডারউইনের মতে এ সকল ‘ সুবিধাপ্রাপ্ত ’ প্রজাতি হলো ইউরোপীয় শ্বেতকায় জাতি সমূহ। এশিয়া ও আফ্রিকায় মনুষ্য প্রজাতি ‘‘ অস্তিত্বের এ সংগ্রামে পিছিয়ে রয়েছে বা তারা হলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি।

তিনি আরো দাবী করেন যে, এ প্রজাতি সমূহ বিশ্বব্যাপী ‘‘ অস্তিত্বের সংগ্রামে সম্পূর্নরূপে পরাজিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ’’।

‘‘শতাব্দীর গননায় অদূর ভবিষ্যতে সভ্য প্রজাতির মানুষ অবশ্যই অসভ্য ও বর্বর প্রজাতির জনগোষ্ঠীকে পৃথিবী থেকে নিমূল করবে এবং তাদের স্থান অধিকার করবে। মানুষ তার নিকটতম প্রজাতি এর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্মুক্ত ও সুশীল হবে। অর্থাৎ বর্তমানে (১৮৫৯ সালে) আফ্রিকার নিগ্রো বা অষ্ট্রেলিয়ান (আদিবাসী) এবং গরিলাদের সাথে যে, ধরনের আচরণ করা হয় তা ককেশীয় - ইউরোপীয় এবং অন্য বেবুন প্রভৃতি নিম্ন প্রজাতির থেকে উন্নত হিসাবে বিবেচনা করা যায়।’’

The Origin of Species এর অন্যত্র তিনি দাবি করেছেন যে, অনুন্নত প্রজাতির জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। উন্নত প্রজাতির মানুষদের তাদের জীবিত ও রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি পশু প্রজনন ও প্রতিপালনের পদ্ধতির সাথে বিষয়টি তুলনা করে উল্লেখ করেন যে ঃ

‘‘ অনুন্নত জনগোষ্ঠীর সাথে সাথে যারা শারিরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল তাদের অচিরেই নির্মূল করা হবে এবং যারা সাধারনতঃ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তারাই টিকে থাকবে। আমরা সভ্য মানুষরা এই নির্মূল প্রক্রিয়ায় বাধা দিয়ে থাকি, আমরা পাগল ও দূর্বলদের, মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য নিবাস নির্মান করি, দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য গরিবী আইন প্রনয়ন করি। আমাদের চিকিৎসকরা শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত এ সব লোকের জীবন বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এটা বিশ্বাস করার যুক্তি সংগত কারন রয়েছে যে, টিকা হাজার হাজার মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। অতীতে যারা শারিরীকভাবে দূর্বল ছিল তারা গুটি বসন্তে মৃত্যু মূখে পতিত হতো। সুশীল সমাজের দূর্বল ব্যক্তিবর্গ, এ সকল কর্মকান্ডকে তাদের দয়া হিসাবে প্রচারনা চালান। যারা পশু প্রজনন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন করেছেন তারা অবশ্যই সন্দেহ করবেন যে, এ ধরনের কর্মকান্ড মানব প্রজাতির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।’’

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ডারউইন তার পুস্তকে অষ্ট্রেলিয়ার (আদিম প্রজাতি) ও আফ্রিকার নিগ্রো গেরিলাদের এক সমতালে নিয়ে এসে দাবী করেছেন যে, এ সকল জনগোষ্ঠী নির্মূল হয়ে (করা)যাওয়া উচিত। তার বিবেচনায় অন্যান্য ‘‘ হীন ’’ প্রজাতির জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়তে দেওয়া উচিত নয় যাতে এগুলি দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে বর্ণবাদী তত্ত্বে ডারউইন উল্লেখিতভাবে তা সমর্থন ও অনুমোদন দিয়েছেন।

ডারউইনের বর্ণবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী সুসভ্য মানুষের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো বিবর্তনবাদের প্রক্রিয়া (অর্থাৎ হীন জনগোষ্ঠীর নিশ্চিহ্ন করার কাজ) ত্বরান্বিত করা। এ পরিস্থিতিতে ‘‘ বৈজ্ঞানিক ’’ দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বর্তমানে এ সব নিম্ন প্রজাতির কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কারন এ হীন জনগোষ্ঠীকে কোন না কোনভাবে নির্মূল হতেই হবে।

ডারউইনের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তার বিভিন্ন লেখায় পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, **Tierra Del Fuego** জনগোষ্ঠি সম্পর্কে তার বর্নবাদী দৃষ্টিভংগী প্রকাশ পায় এ ব্যাপারে এলাকার স্থানীয় অধিবাসী সম্পর্কে তার বর্ননায়। তিনি লিখেছেন ‘‘ এরা সম্পূর্ন নগ্ন থাকে, রং মেখে থাকে, পশুর মত যাচ্ছে তাই আহার করে, সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রনহীন, তাদের গোত্রের বাইরের লোকের প্রতি নিষ্ঠুর, তারা তাদের শত্রুকে নিপীড়ন করে আনন্দ পায়, স্ত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রানীকে বলি দেয়,

শিশুদের হত্যা, করে সর্ম্পূন কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি জনগোষ্ঠী '' অথচ ডারউইনের পূর্বে গবেষক **WP Snow** একই এলাকায় ভ্রমন করে সম্পূর্ন ভিন্ন চিত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এরা খুব শক্তিশালী যোদ্ধা। তারা তাদের শিশূদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, তাদের অনেক শিল্পকলা অতি সমৃদ্ধ, তারা সম্পদের উপর অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তারা তাদের বৃদ্ধা মহিলাদের কর্তৃত্ব মেনে চলে। ''

এ সকল উদাহরন থেকে দেখা যায় যে, ডারউইন একজন পুরোপুরি বর্ণবাদী লোক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ডারউইন তার পুস্তক **Decent of Man** এ সুসভ্য মানুষ্য প্রজাতির সাথে অনগ্রসর প্রজাতির তুলনা প্রসংগে বহু ধরনের মন্তব্য করেছিল যা **Benjamin Farrington** তার বই **What Darwin Really Said** বই এ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

''তাছাড়া, ডারউইনের মতবাদে সৃষ্টিকর্তার অস্বীকৃতির কারণে সব মানুষকে আল্লাহ সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন এ বাস্তব সত্য তা জনগন বুঝতেই পারলোনা। বর্ণবাদের উত্থান ও তার বিশ্বব্যাপী গ্রহনযোগ্যতার অন্যতম কারণ হলো এই ডারউইনবাদ।''

আমেরিকান বৈজ্ঞানিক **James Ferguson** সৃষ্টিকর্তার অস্বীকৃতির সাথে বর্ণবাদের উত্থানের গভীর সম্পর্কের বিষয় এভাবে বর্ননা করেছেন ঃ

নতুন নৃতত্ত্ব অল্পদিনের মধ্যেই মানব সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে দুই বিবাদমান তত্ত্বের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করলো। মানব সমাজে প্রচলিত বিদ্যমান ধারনা/মতবাদ ছিল যে মানুষের গায়ের রং বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেই যাই হোক না কেন সকল মানুষ আদম (আঃ) থেকে আগত এবং আল্লাহ আদম সৃষ্টি করেছেন। সবাই এক বংশজাত **(MONOGENISM)** এক বংশজাত। যা একটি ধর্মীয় বিশ্বাস যা গীর্জা কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা। এটা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী গ্রহনযোগ্য ছিল। কিন্তু যখন এই ধর্মীয়কর্তৃত্বের বিরোধীতা করে নতুন মতবাদ অর্থাৎ মানুষের **(POLYGENISM)** একাধিক বংশলতিকা রয়েছে। অর্থাৎ কোন একক ব্যক্তি মানুষের আদি পিতা নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার পিতাও বিভিন্ন। ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভ্রাতিত্বের বন্ধন বিদ্যমান ছিল তা ছিন্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হলো।

ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ **LALITA VIDYARTHI** ডারউইনের বিবর্তনবাদের মাধ্যমে বর্ণবাদ কিভাবে সমাজ বিজ্ঞানে গৃহীত হয় তার বিবরণ উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

'' ডারউইনের যোগ্যতম টিকে থাকে মতবাদ সমাজ বিজ্ঞানীগন স্বাগত জানালেন। তারা বিশ্বাস করলেন মানব প্রজাতি বিভিন্ন বিবর্তন প্রক্রিয়া অতিক্রম করে তার চূড়ান্ত অবস্হা (অর্থাৎ) শ্বেতকায়দের সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ বিজ্ঞানী বর্ণবাদকে বাস্তব সত্য হিসাবে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন বা মেনে নিলেন।''

ডারউইন পরবর্তী বিবর্তনবাদীরা তার বর্ণবাদী মতাদর্শ থাকার বিষয়টি জোরেশোরে প্রচার-প্রকাশ করতে থাকলেন। এ কাজ করতে তারা সকল নীতি আদর্শ বর্জন করে অনেক বৈজ্ঞানিক অসংগতি ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহন করেন। এরা ভাবতে থাকেন, এ তত্ত্ব প্রমানের মাধ্যমে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমান করে ভিন্ন প্রজাতির মানব সন্তানকে নির্যাতন, শাসন, শোষন ও প্রয়োজনবোধে নিশ্চিহ্ন করার ''প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার '' অর্জন করেছেন।

Stephen Jay Gould তার পুস্তক **The Mismeasure of Man** এর তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু সংখ্যক নৃতত্ত্ববিদ, শ্বেতাংগদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার জন্য মিথ্যা তত্ত্ব ও উপাত্ত ব্যবহার করেছেন। **Gould** এর মতে এ প্রক্রিয়ায় তাদের দেখা/পাওয়া জীবাশ্ম, মাথার খুলি ও মস্তিকের আকার সম্পর্কে মিথ্যাচার করেছেন। তাদের ধারনা ছিল মানব বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মস্তিকের আকারের একটি সম্পর্ক আছে। অনেক নৃতত্ত্ববিদ ককেশীয়দের খুলির আকার ইচ্ছাকৃতভাবে বড় দেখিয়ে ভারতীয় ও কালো জনগোষ্ঠির বুদ্ধি কম হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। যা ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষনার নামে করে চৌর্যবৃত্তি/জোচ্চুরী বা জালিয়াতি।

Gould তার পুস্তক **Ever Since Darwin** এ উল্লেখ করেছেন যে, কিছু বিকৃত তথ্যের মাধ্যমে তাদের মিথ্যা দাবী অর্থাৎ কিছু কিছু মানুষ প্রজাতি '' হীন '' প্রমান করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন ঃ **Hacekel** ও তার সংগীরাও উত্তরের শ্বেতাংগ জনগোষ্ঠির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্য জোর দাবী উত্থাপন করেন। মানব শরীর ও তার ব্যবহার সম্পর্কীত বিভিন্ন জীবাশ্ম ও অন্যান্য প্রমানাদি (মস্তিক থেকে বোতাম পর্যন্ত) ঘষা-মাজা করে তাদের দাবীর সমর্থনে বিভিন্ন তথ্য/তত্ত্ব উপস্থাপন করতে থাকেন। **Herbert Spencer** লিখেছেন ঃ ''অসভ্যদের বুদ্ধিবৃত্তিও তাদের সন্তানদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটে।'' ১৮৬৪ সালে **Carl Vogt** খুব জোরে-শোরে বলতে শুরু করেন যে, '' একজন পূর্ন বয়স্ক নিগ্রোর বুদ্ধিবৃত্তির মাত্রা একটি শিশুর ন্যায় আমরা অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে যদিও কোন কোন গোত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। অদ্ভুত সংঘ, প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে, কিন্তু অবশিষ্টরা বা সমগ্র (কৃষ্ণাংগ) প্রজাতি সামগ্রিকভাবে না অতীতে না বর্তমানে মানব জাতির উন্নয়নে এমন কোন ভূমিকা রাখে নাই যে কারনে তাদের বাঁচিয়ে রাখা যায়।''

ফরাসী এনাটমিষ্ট **ETIENNESERRES** কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষরা আদিম (অনগ্রসর বা অনুন্নত প্রজাতি) কারন তাদের **Belly Button** একটু নীচের দিকে অবস্থিত।

''ডারউহনের সমসাময়িক বিবর্তনবাদী **Havelock Ellis** শ্রেষ্ঠ ও ''হীন'' প্রজাতির পার্থক্যের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, অধিকাংশ আফ্রিকান প্রজাতির শিশু, কদাচিত কোন ইউরোপীয় শিশু থেকে কম বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। কিন্তু আফ্রিকান শিশু বয়স বৃদ্ধির সাথে নির্বোধ ও স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তার সমগ্র জীবন একটি সংকীর্ন/গোঁড়া রীতি-নীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে একজন ইউরোপীয় তার শিশু সুলভ উৎফুল্লতা বজায় রাখে।''

ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ **Vacher de Lapouge** দাবী করেন যে, ''অশ্বেতাঙ্গ শ্রেনীভুক্ত মানব সন্তানগন অসভ্য মানব প্রজাতির বংশধর অথবা মিশ্ররক্তের অধঃ পতিত জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি। তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন গোরস্থান থেকে প্যারিসের অভিজাত ও নীচু শ্রেনীর মানুষের খুলি গবেষনা করেন। তার গবেষনার যে ফলাফল প্রকাশ করেন তা হলো ঃ একটি নির্দিষ্ট আকৃতির খুলির অধিকারী ব্যক্তি স্বভাবতই ধনী, আত্মবিশ্বাসী, মুক্ত, স্বাধীন, রক্ষণশীল, অল্পে তুষ্ট, একজন আর্দশ সেবক/দাস হওয়ার যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নির্বাচনের মাধ্যমেই শ্রেনী বিন্যাস হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠ মনুষ্য প্রজাতির সদস্যরাই উচ্চতর শ্রেনীভুক্ত হয়ে থাকে। মানুষের খুলির আকারে সাথে আনুপাতিক হারে মানুষ ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে থাকে। **Lapouge** আরো বলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষ আকৃতি গোল অথবা চোখা

হওয়ার জন্য হত্যা করবে। তার এ ভবিষদ্বানী সত্য হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে নৃশংসভাবে শুধুমাত্র বর্ণবাদের কারণে হত্যা করা হয়।

শুধুমাত্র নৃবিজ্ঞানী নয় বরং **Entomologist (**কীট তত্ত্ববিদ**)** ও ডারউইনের বিকৃত বিবর্তনবাদে গভীর বিশ্বাসী হয়ে বর্ণবাদের মতাদর্শের অনুসারী হয়েছেন। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৬১ সালে একজন বৃটিশ কীটতত্ত্ববিদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের দেহে বসবাসকারী উকুনের উপর গবেষনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক নির্দিষ্ট প্রজাতির উকুন ভিন্ন মনুষ্য প্রজাতির দেহে বাস করতে পারেনা। বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে এটা হাস্যপদ ছাড়া অন্য কিছু বিবেচনা করা যায় না। যখন দেখা যায় যে এমনকি বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত এ ধরনের কথা ঘোষনা করেন, তখন বুঝতে হবে, কিছু সংখ্যক গোঁড়া বর্ণবাদী এ ধরনের অযৌক্তিক অবচীন ও সম্পূর্ন অর্থহীন শ্লোগান ব্যবহার করতে পারে এমন কি এও বলা যেতে পারে নিগ্রো উকুন গুলো নিগ্রো।''

ডারউইন তত্ত্বের বর্ণবাদী দিক উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় শ্বেতাংগদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারন ঐ সময় একজন শ্বেতাংগ তাদের অমানবিক ও নিষ্ঠুর কর্মকান্ডের তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা খুঁজছিলেন।

বৃটিশ উপনিবেশবাদ ও ডারউইনবাদ

ডারউইনের বর্ণবাদ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে দেশটি সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় তাহলো তার মাতৃভূমি বৃটেন। ডারউইন যখন এ মতবাদ উপস্থাপন করেন তখন গ্রেট বৃটেন পৃথিবীর উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্য হিসাবে শীর্ষে অবস্হান করছে। ভারত থেকে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ বৃটিশ সাম্রাজ্যের করতলগত। শ্বেতাংগ মানুষ তাদের স্বার্থে পৃথিবী লুন্ঠন করছে। তবে ইতিহাস তাদের লুটেরা হিসাবে চিহ্নিত করুক তা কোন রাষ্ট্র পছন্দ করছিল না। এ কারনে তারা তাদের শাসন ও শোষন যে সঠিক তার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করছিল। যে সমস্ত দেশ উপনিবেশ হিসাবে তাদের অধীন ছিল সে সমস্ত দেশের জনগন '' আদিবাসী '' '' পশু সুলভ জীবন্ত প্রানী'' হিসাবে চিহ্নিত করা। যে সকল জনগোষ্ঠিকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা, বা যাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে তারা প্রকৃত পক্ষে স্বাভাবিক মানব সন্তান নয় বরং তারা '' অর্ধ মানব -অর্ধ পশু। '' তাই তাদের সাথে যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে তা অপরাধ নয় এটা প্রমান করার জন্য পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে উপনিবেশবাদ পৃথিবীতে প্রবর্তনের সময় থেকে এ ধরনে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান অব্যাহত ছিল। **Chirstopher Columbus** তার আমেরিকা যাত্রার সময় দাবী করেন যে, কোন কোন জনগোষ্ঠি অর্ধ-পশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন। এই দাবী অনুযায়ী আমেরিকার আদিবাসীগন মনুষ্য সন্তান নয় বরং তারা এক ধরনের উন্নত পশু প্রজাতির। এ কারনে তাদেরকে স্হানীয় উপনিবেশবাদীদের সেবায় নিয়োজিত করা যায়।

আমেরিকা আবিষ্কার সংক্রান্ত সিনেমাগুলিতে **Chirstopher Columbus** কে যতই স্হানীয় জনসাধারনের প্রতি দয়ালু, হৃদয়বান ও নম্র হিসাবে চিহ্নিত করা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তিনি 'নেটিভ' আমেরিকানদের মনুষ্যপদ বাচ্য হিসাবে বিবেচনা করতেন না।

Chirstopher Columbus প্রথমেই সেখানে ব্যাপক গনহত্যা সংঘটিত করেন। তিনি যে সমস্ত দেশ আবিষ্কার করেছেন, সে গুলি উপনিবেশে পরিনত করেন এবং ''নেটিভদের'' ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করেন। দাস ব্যবসা শুরু করার ''কৃতিত্ব '' তাকেই দেওয়া যায়। স্পেনীয় উপনিবেশবাদী তাদের ''নির্যাতন ও শোষন নীতি '' বাস্তবায়ন করে এবং তা বহাল রাখে ও গণহত্যা সমূহ ব্যাপক আকার ধারন করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, কোন দ্বীপে **Columbus** প্রথম আগমন করেন তখন এর জনসংখ্যা ছিল ২০০০০০। বিশ বছর পর এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০,০০০ এবং ১৫৪০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র এক হাজারে। ১৫১৯ সালের ফ্রেব্রুয়ারীতে যখন বিখ্যাত স্পেনীয় বিজয়ী **Cortes** মেক্সিকোয় আগমন করেন তখন এখানকার জনসংখ্যা ছিল ২৫ মিলিয়ন। ১৬০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১ মিলিয়নে। ১৪৯২ সালে **Hispaniola** দ্বীপে জনসংখ্যা ছিল ৭-৮ মিলিয়ন যা, ১৪৯৬ সালে কমে ৪ মিলিয়ন দাড়ায় এবং ১৫৭০ সালে এদের মধ্যে মাত্র ১২৫ জন জীবিত থাকে। ঐতিহাসিকগনের হিসাব অনুযায়ী **Columbus** এ মহাদেশে পর্দাপন করার পর ১০০ বছরের কম সময়ের মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন লোককে উপনিবেশবাদীরা হত্যা করে। যখন **Columbus** আমেরিকা আবিষ্কার করেন (১৪৯২ সাল) তখন উপনিবেশের জনসংখ্যা ছিল ৩০ মিলিয়ন। তখন থেকে অদ্যাবধি গণ হত্যার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এটি একটি প্রায় হারানো প্রজাতি হিসাবে টিকে আছে যাদের সংখ্যা ২ মিলিয়নেরও কমে দাড়িয়েছে। এ সকল ব্যাপক ও নিষ্ঠুর গণহত্যার প্রধান কারন হচ্ছে এ সব 'নেটিভ' জনসাধারনকে আদম সন্তান হিসাবে বিবেচনা না করে বরং তাদেরকে পশু হিসাবে গন্য করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এ দাবী বা যুক্তি অধিকাংশ লোকই গ্রহন করেনি। কারন ইউরোপে তখন সকল মানুষ এক আদমের বংশধর এবং আল্লাহ সকলকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন এ ধর্মীয় দাবী/মতামত সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো। স্থানীয় মানুষের সাথে অমানবিক আচরনের তারা তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহন করে। এ ব্যাপারে **Barthlome de las Casas (Columbus** এর আমেরিকা অভিযাত্রার সহগামী) এর নিকট **Chipas** এর **Bishop** এর পত্রটি একটি উত্তম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বিশপ তার পত্রে উল্লেখ করেন ''প্রতিটি নেটিভ একজন প্রকৃত আদম সন্তান '' পোপ পল নেটিভদের সাথে অমানবিক আচরণ করার জন্য ১৫৩৭ সালে এ ফতোয়ায় উপনিবেশবাদীদের অভিশাপ দেন এবং ঘোষনা করেন যে, নেটিভরা সত্যিকার মানব সন্তান এবং তারা ধর্ম গ্রহনের মাধ্যমে ঈমানদার হতে পারেন।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। জনগনের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনের ব্যাপক প্রচার, প্রভাব এবং ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হওয়ার কারনে মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্টি তা অস্বীকার করার প্রবনতা সৃষ্টি হয। ফলে এ সময় থেকে ''বর্ণবাদ '' এর উত্থান ঘটে। উনবিংশ শতকের ডারউইনের বস্তবাদী দর্শন এতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়।

James Joll দীর্ঘ দিন যাবত অধ্যাপক হিসাবে অক্সফোর্ড, ষ্টানফোর্ড ও হ্যার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। তিনি তার **EUROPE SINCE 1870** গ্রন্থ যা এখন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমূহের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত আছে। এ পুস্তকে তিনি ডারউইনবাদ, বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক সম্পর্কে বর্ননা করেছেন ঃ

‘‘সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান উৎসাহব্যঞ্জক মতবাদ হলো সাধারনভাবে যাকে সামাজিক ডারউইনবাদ হিসাবে শ্রেনী বিন্যাস করা যায়। এ মতবাদে রাষ্ট্রসমূহ অস্তিত্বের জনা এক চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত কোন কোন মনুষ্য প্রজাতিকে অন্যদের চেয়ে বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত এবং এ সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজাতি বল প্রয়োগের মাধ্যমে সবসময় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। **Charles Darwin** বৃটিশ প্রকৃতিবিদ যথাক্রমে ১৮৫৯ সালে **The Origin of species** এবং ১৮৭১ সালে **The Descent of Man** পুস্তকটি প্রকাশ করেন। এই পুস্তক দুটিতে প্রকাশিত ভাবধারা ইউরোপীয় চিন্তা জগতে বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক বির্তকের ঝড় তোলে। ডারউইন এবং তার সমসাময়িক চিন্তাবিদ যাদের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিকও ছিলেন **Herbert Spencer** ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম, এদের চিন্তাধারা অতি দ্রুতগতিতে এমন এমন বিষয় বা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়, যার সাথে বিজ্ঞানের দূরতম সম্পর্ক নাই। ডারউইনের মতবাদের একটি দিক হচ্ছে তা এমন একটি প্রয়োগিক, বিশ্বাস সৃষ্টি করে তা হলো সমাজ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও সীমিত সম্পদের কারনে জনগনের মধ্যে অস্তিত্বের জন্য একটি সার্বক্ষনিক দ্বন্দ্ব সংগ্রাম বিরাজ করে। এ যুদ্ধে সবচেয়ে ‘‘ শক্তিশালী তথা যোগ্যতম ’’ বিজয় লাভ করে টিকে থাকে অন্যরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমাজে এই মতবাদ চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে ‘‘ টিকে ’’ থাকা প্রজাতির দ্বন্দ্ব সংগ্রামে কৃত অপকর্মকে একটি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করা সহজসাধ্য হয়। অর্থাৎ কোন বিশেষ মানুষ প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্ব।

‘‘ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ’’ মতবাদ অন্য একটি মতাদর্শের সাথে সহজেই জড়িত হয়ে যায় তা হলো কোন বিশেষ মনুষ প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্ব। ফরাসী লেখক **Count Joseph Arthur Gobineau** ১৮৫৩ সালে **An Essay on the Inequaility of Human Races** নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি তার পুস্তকে জোর দাবী করেন যে, মানব সমাজে সেই মনুষ্য প্রজাতির ‘‘শ্রেষ্ঠত্ব ’’ বেশী বজায় থাকে, যে প্রজাতি অধিক জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় **Gobineau** এর মতে আর্যজাতি সবচেয়ে সফল জাতি হিসাবে টিকে আছে। **Houston Stewart Chambrelain** এ মতবাদ আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। জার্মান জাতীয় নাজী নেতা এডলফ হিটলার **Chambrelain** কে খুব পছন্দ করতেন এ কারনে ১৯২৭ সালে এই লেখকের মৃতুশয্যায় হিটলার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমানিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী, বর্ণবাদী ও ডারউইনবাদী বিশ্বাসীদের মতাদর্শের মধ্যে অদ্ভুত সংযোগ আছে। এমনকি হিটলার ব্যক্তিগতভাবে এ ধারায় অর্ন্তভুক্ত রয়েছেন। উনবিংশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী ও নাজীবাদী এ দুই মতাদর্শের ভিত্তি ভূমি হিসাবে ডারউইনবাদ ভুমিকা রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এ শতকে এ মতাদর্শ বিশ্বকে রক্তস্নানের মাধ্যমে কলংকিত করেছে। বিংশ শতাব্দীতে তারা এ ধারা অব্যাহত রেখেছে।

ভিক্টোরিয়া যুগের গ্রেটবৃটেন ডারউহনবাদকে একটি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ হিসাবে বিবেচনা করেছে। উপনিবেশবাদ থেকে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে গ্রেট বৃটেন। তাই সর্বাত্মক উপনিবেশবাদী

শক্তি হিসাবে বৃটেন তার নিজ স্বার্থে শোষন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি না করার কোন কারন সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন দেখেনি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নোংরা রাজনীতির শিকার হলো চীনের বিরুদ্ধে ''আফিম যুদ্ধ।''গ্রেট বৃটেন ভারতে প্রস্তুতকৃত আফিম উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে চোরাচালানীদের মাধ্যমে চীনে বিক্রয় করতো। সময়ের আবর্তে এই আফিম চোরচালানীদের কার্যক্রমে অধিক গতি সঞ্চারিত হয়। কারন বৃটেন এ থেকে তার বিদেশ বানিজ্যের ঘাটতি পুষিয়ে নিত। চীনদেশে আফিমের এই অনুপ্রবেশ দেশটির রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম কর্তৃত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে চীনা সমাজে তা ব্যাপকভাবে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষিতে চীন সরকার আফিম আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে বাধ্য হয়। ফলে শুরু হয় প্রথম আফিম যুদ্ধ (১৮৩৮-১৮৪২) শুরু হয়। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এ যুদ্ধের ফলে দেশটি দেউলিয়া হয়ে যায়। সামরিক শক্তির অপ্রতুলতা ও বিদেশী শক্তির হাতে তাদের পরাজয়ের কারনে চীন তার মাথা নত করতে বাধ্য হয়।১৮৪২ সাল থেকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ আস্তে আস্তে চীনের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে বিভিন্ন জনবসতি(**Concessions**) কেন্দ্র গড়ে তোলে।তারা চীনা সরকারের কাছ থেকে বিস্তীর্ন এলাকার (**Portquarter Concession**) ভুমি ইজারা নেয় এবং দেশটিকে এভাবে বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করে যাতে করে তা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রশক্তি দূর্বল এবং দেশটি দারিদ্রের করাল গ্রাসে পতিত হয় এবং ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় ভূ-খন্ডের সংকোচনে দেশটি যুদ্ধ বিগ্রহের শিকারে পরিনত হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি চীনা অভিজ্ঞাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং, উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির নির্যাতন ও দুঃখ কষ্ট, বিপর্যয় দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার জনগনও প্রত্যক্ষ করে।

বৃটেনের এই নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের যৌক্তিক ভিত্তি এবং তাদের নীতির সঠিকতা প্রমান করার দায়িত্ব বৃটিশ সমাজ বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকদের উপর বর্তায় । এক্ষেত্রে চার্লস ডারউইনের মতবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ও কার্যকর হিসাবে বিবেচিত হয় । কারন ডারউইন দাবী করেন যে বিবর্তনবাদের বিভিন্ন স্তরে একটি '' শ্রেষ্ঠ মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় আছে এবং এ সকল ''উন্নত প্রজাতি হলো শ্বেতাংগ প্রজাতি'' এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, অন্যান্য মনুষ্য প্রজাতির উপর শ্বেতাংগদের এই অত্যাচার ও অবিচার ও নিষ্ঠুর আচরন একটি ''প্রাকৃতিক আইন ।''

বর্ণবাদী ও উপনিবেশবাদীদের পক্ষে ডারউইন যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, এর প্রেক্ষিতে **Swiss Federal Insititute of Technology** এর প্রখ্যাত চীনা বিজ্ঞানী **Kenneth J. Hsu** বলেন যে, '' ডারউইন ভিক্টোরিয়া যুগের একজন বৈজ্ঞানিক এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত সদস্য হিসাবে বলপূর্বক চীনে গানবোট পাঠিয়ে চীনে আফিম আমদানী করা হয়। আর এ সকল কর্মকান্ডই করা হয়েছে প্রতিযোগীতা তথ্য মুক্ত বানিজ্য এবং যোগ্যতমদের টিকে থাকার নীতি বাস্তবায়নের নামে।''

ডারউইনের তুর্কীদর বিরুদ্ধে বৈরিতা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ওসমানী সাম্রাজ্য (**OTTOMAN EMPIRE**) বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের নিকট প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিনত হয়। এ সময়ে ওসমানী সাম্রাজ্যের সীমা ইয়েমেন

থেকে শুরু করে বসনীয় হারজেগোবিনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত সময়ে এই বিস্তৃন এলাকা নিয়ন্ত্রন করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। যদিও ইতোপূর্বে ওসমানী সাম্রাজ্যের শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকত। এ পরিস্থিতিতে খৃষ্টান সংখ্যালঘুরা স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করছিল এবং রাশিয়ার মতো বৃহৎ সামরিক শক্তি ওসমানী সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৃটেন ও ফ্রান্স ওসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধ শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছিল। বিশেষ করে বৃটেন, ওসমানী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের ওসমানী সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। বৃটেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশর দখল করে যা ওসমানী সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। বৃটিশ উপনিবেশবাদীগন পরবর্তীতে ওসমানী সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত মধ্যপ্রাচ্য দখল করার পরিকল্পনা করে।

বৃটেন সবসময় উপনিবেশবাদী নীতির স্বপক্ষে বর্ণবাদকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করত। বৃটিশ সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে তুর্কি জাতিকে একটি ‘‘ অনুন্নত’’ জনগোষ্ঠি হিসাবে চিহ্নিত করত।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী **Willam Ewart Gladstone** প্রকাশ্যে ঘোষনা করতেন যে, ‘‘তুর্কি জনগোষ্ঠি মনুষ্য প্রজাতির সদস্যই নয় বা মনুষ্য পদবাচ্য নয় এবং মানব সভ্যতার স্বার্থে তাদেরকে এশিয়ার **Steppes** অঞ্চলে বিতাড়িত এবং এনতোলিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করা উচিত।’’ বৃটিশ সরকারের এই অভিমত ও বাক্যবাণ ওসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে অব্যাহত ছিল। বৃটেন তুর্কি জাতিকে একটি অনুন্নত জনগোষ্ঠি হিসাবে চিত্রিত করত যাতে এই জাতি ‘‘অনগ্রসর ইউরোপীয় শ্বেতাংগদের কাছে তাদের মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এ সকল প্রচারনায় তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হচ্ছে চার্লস ডারউইন।

তুর্কী জাতি সম্পর্কিত ডারউইনের অভিমত ১৮৮৮ সালে **The Life and Letterts of Charles Darwin** নামক পুস্তকে দেখা যায়। ডারউইন মতামত প্রকাশ করেন যে, ‘‘তথাকথিত অনুন্নত প্রজাতি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানব সভ্যতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।’’

পরবর্তীতে তুর্কী জাতি সম্পর্কে তার মন্তব্য হলো ঃ ‘‘ আমি যদি আপনাকে সভ্যতার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের সংগ্রাম ও এবং এর ধারাবাহিকতার ভুমিকা উল্লেখ করি তা বিশ্বাস করাই আপনার জন্য কঠিন হবে। স্মরণ করুন কয়েক শতক পূর্বে তুর্কীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ার আতংকের ঝুঁকির মধ্যে ইউরোপী সময় কাটিয়েছে। আর বর্তমানে যা একটি হাস্যস্পদ ব্যাপার।

এ অস্তিত্বের সংগ্রামে অধিকতর সুসভ্য ককেশীয় (ইউরোপীয়) প্রজাতি শুন্য গর্ভ তুর্কীদের পরাজিত করেছে। অদুর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীতে কত নিম্নতর (আদিম) প্রজাতি যে উন্নত ও সুসভ্য প্রজাতির হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার ইয়ত্তা নাই।’’

ডারউইনের এ সমস্ত অসংগতিপূর্ন ও অসংলগ্ন কথাবার্তা ওসমানীয় সমাজের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুনীতি বাস্তবায়নে লিখিত প্রচারনা দলিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ প্রোপাগান্ডা হাতিয়ার অত্যন্ত কার্যকর হিসাবে প্রমানিত হয়। ডারউইনের ভবিদ্বানী তুর্কী জাতি অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ‘‘ এবং বিবর্তনবাদের অমোঘ আইন অনুযায়ী তা ঘটবে ’’ এ

ধরনের মতামত তুর্কীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টির প্রচারনার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। ডারউনের মতবাদ বাস্তবায়নে বৃটেনের ইচ্ছার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। এ মহাযুদ্ধ ১৯১৪ সালে শুরু হয় একদিকে জার্মানী ও অষ্টে-হাঙ্গেরীয় সম্রাজ্য ও অপরপক্ষে বৃটেন ও তার মিত্র ফ্রান্স ও রাশিয়ার পারস্পরিক স্বার্থের বিরোধীতার মাধ্যমে এ যুদ্ধের শুরু হয়। ওসমানী সাম্রাজ্য ধ্বংস ও ভাগাভাগির বিষয়টি এ যুদ্ধের একটি অলিখিত অথচ সুচিন্তিত উদ্দেশ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়।

বৃটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দুই দিক থেকে আক্রমন পরিকল্পনা করে। এ যুদ্ধের প্রথম ফ্রন্ট ছিল ক্যানাল, প্যালেষ্টাইন ও ইরাক থেকে। উদ্দেশ্য ছিল এ সকল অঞ্চলে অবস্থিত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত মধ্যপ্রাচ্যের ভুমি গ্রাস করা। দ্বিতীয় ফ্রন্ট ছিল গ্যালিপোলি, প্রথম মহাযুদ্ধের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়। বীরোচিত যুদ্ধে তুর্কী সেনাবাহিনীর ২৫০,০০০ লোক নিহত হয়। বৃটিশরা এ যুদ্ধে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ কলোনীর আধিবাসী ভারতীয়, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এর সৈন্য ব্যবহার করে। কারণ তুর্কীরা হলো ''অনুন্নত প্রজাতি '' এ ধরনের প্রজাতির সাথে সুসভ্য বৃটিশদের যুদ্ধে অবতীর্ন হওয়া তাদের বিবেচনায় ''সম্মানজনক '' নয়।

ডারউইনের তুর্কীদের বিরুদ্ধে বৈরীতা প্রথম মহাযুদ্ধের পরও অব্যাহত ছিল। এমন কি বর্তমানেও ইউরোপীয় নিউ-নাজীরা যখন ইউরোপে তুকীদের প্রতারনামূলকভাবে আক্রমন করে, তখন আক্রমনকারীগন তুর্কী জাতির বিরুদ্ধে ডারউইনের '' অসংলগ্ন ও ফালতু '' অভিমত তাদেরকে উৎসাহিত বা উজ্জীবিত করে। ডারউইনের এসব মতামত বা অভিমত বর্তমানে (এক বিংশ) বিরুদ্ধবাদী বর্ণবাদীগন কর্তৃক প্রচারিত তুর্কীদের শত্রুদের ইন্টারনেটের পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

আমেরিকার বর্ণবাদ ও সামাজিক ডারউহনবাদ

সামাজিক ডারউইনবাদকে শুধুমাত্র বৃটেনই নয় বরং সকল বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন যোগায়। এ মতাদর্শের সমর্থনকারীদের নেতাদের শীর্ষে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট **Theodore Roosevelt** তিনি এ মতাদর্শের প্রধান প্রবক্তা ও বাস্তবায়নকারী। প্রেসিডেন্ট **Roosevelt** এ কর্মসূচীর অর্থাৎ জাতিসত্ত্বার বিলোপ **(Ethnic Cleansing)** আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের **(Red Indian)** সংরক্ষিত এলাকায় বাধ্যতামূলক আবাসন প্রক্রিয়ার নামে নিধন **The Winning of the West** পূস্তকে গণহত্যা ও জাতিগত সংগ্রামের মাধ্যমে নিধন একটি অপরিহার্য কার্যক্রম ও মতাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ডারউইনবাদ। কারণ এ মতাদর্শে স্থানীয় অধিবাসীদের ''অনুন্নত '' প্রজাতির জনগোষ্ঠি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

Roosevelt পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন যে, নেটিভ আমেরিকানদের সাথে সম্মানিত কোন চুক্তি বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয়তা নাই যা '' অনুন্নত প্রজাতি '' তত্ত্ব অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য। ১৮৭১ সালে আমেরিকার কংগ্রেস নেটিভ আমেরিকানদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি অগ্রাহ্য করে তাদেরকে মরু এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য করে, যাতে মরুভুমিতে তারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে। যদি চুক্তির অপর পক্ষকে ''মানুষ হিসাবে বিবেচনাই না করা হয় '' তাহলে তাদের সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন করা বা মান্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে কি ?

Roosevelt প্রস্তাবিত পূর্বোল্লিখিত বর্ণবাদী যুদ্ধের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইংরেজী ভাষাভাষীদের **(Anglo Saxons)** পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব মর্মে বিবেচনা করতেন। **Josiah Strong** আমেরিকান বিবর্তনবাদী **Protestant** বিশপ ও **Anglo Saxon** বর্ণবাদ তত্ত্বের একজন বিশেষ প্রবক্তা ছিলেন। তিনিও বর্ণবাদ তত্ত্ব সমর্থনে একই যুক্তি প্রয়োগ করতেন। তিনি লিখেছেন, '' তখন বিশ্ব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করবে। সেই চূড়ান্ত প্রতিযোগীতা যে ব্যাপারে **Anglo Saxons**-দের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। বিষয়টি আমি যদি যথাযথভাবে বুঝতে ভুল না করি। তাহলে এই শক্তিশালী প্রজাতি মেক্সিকো, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে ও আফ্রিকা অতিক্রম করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে এবং এ ব্যাপারে কারো কোন রকম সন্দেহ করার অবকাশ নাই যে এই প্রতিযোগীতার ফল হবে ''যোগ্যতমদের টিকে থাকার সংগ্রাম।'' কালো মানুষের শত্রুদের নেতৃস্থানীয়দের সবাই সামাজিক ডারউইনবাদের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। তাদের বর্ণবাদী তত্ত্ব মানবজাতিকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস ও সংজ্ঞায়িত করে এবং শ্বেতাংগদের সবচেয়ে উন্নত প্রজাতি হিসাবে ঘোষনা করে। পক্ষান্তরে কালো প্রজাতিকে সবচেয়ে অনুন্নত আদিবাসী হিসাবে বিবেচনা করে তাই সংগত কারনেই তারা ডারউইনবাদের বর্ণবাদী আর্দশকে আকড়ে ধরেন।

বিবর্তনবাদের ঘোর বর্ণবাদী তাত্ত্বিক, **Henry Fairfield Osborn** তার **The Evoluation of Human Races** শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ‘‘ একজন বয়স্ক নিগ্রো মানুষের গড়পড়তা বুদ্ধি বৃত্তি সাধারন জনগোষ্ঠির **(Homo Sapiens)** এগার বৎসর বয়স্ক মানব শিশুর সমান’’

এ যুক্তিতে কালোরা মনষ্যই নয়। অন্য একজন বিখ্যাত বর্ণবাদের সমর্থনকারী বিবর্তনবাদী **Carleton Coon,** ১৯৬২ সালে তার প্রকাশিত পুস্তক **The Origins of Race** এ মত ব্যক্ত করেন যে, সাদা ও কালো দুটি আলাদা প্রজাতি। **Homo Erectus** যুগে এ বিভাজন সম্পন্ন হয়েছে। এই বিভাজনের পর শ্বেতকায় প্রজাতি বিবর্তনের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত হয়েছে। কালো মানুষদের এই বর্ন বৈষম্যের চিন্তাধারার ধারক-বাহকরা এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দীর্ঘ দিন যাবত তাদের মতাদর্শে ব্যবহার করে আসছেন।

আমেরিকান সমাজে বর্ণবাদের ঘোর সমর্থনকারী একটি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিদ্যমানতার কারনে তা দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণবাদের বিরোধী হিসাবে খ্যাত **W E Dubois** উল্লেখ করেন যে ‘‘ বিংশ শতকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বর্ণবাদ। বর্ণবাদের সমস্যা এমন একটি রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে দেশটি আবার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে আগ্রহী। কোন কোন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয়েছেও। এটি একটি আপাত বিরোধী সত্য যার কোন গুরুত্বই প্রদান করা হয় না। উল্লেখ্য দাসপ্রথার অবসান কালো ও সাদা জনগোষ্ঠির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আনয়নের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি মনে করেন আইনী বৈষম্য যা অল্প সময়ের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে এটাই বাস্তবে আইন সংগত হিসাবে পরিগনিত হয়েছে এবং এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান লাভের উপায় ও পন্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।’’

এ সময়েই প্রথম বর্ণবৈষম্যমূলক আইন প্রবর্তন করা হয় যা কুখ্যাত **Jim Crow Laws** হিসাবে পরিচিত। (শ্বেতাংগদের প্রিয় কালো মানুষদের কাছে নিন্দিত নাম হলো **Jim Crow)** কালো লোকদের কখনই ‘‘মানুষ’’ হিসাবে গন্য করা হতো না। সর্বক্ষেত্রে তাদের অসম্মান ও অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। অধিকন্তু এটা শুধুমাত্র কয়েকজন বর্ণবাদী ব্যক্তির মনোভাব ছিলনা বরং এটা আমেরিকান সরকার কর্তৃক প্রনীত আইনের মাধ্যমে নির্ধারন করা হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে টেনেসী **(Tennesse)** রাজ্যে সর্বপ্রথম সাদা ও কালোদের জন্য পৃথক ট্রেন ও ট্রাম ব্যবহারের জন্য আইন অনুমোদিত হয়। তাৎক্ষনিকভাবে দক্ষিনের সকল রাষ্ট্রে ট্রেনের অনুরূপ আইন চালু হয়। ফলে ‘‘শুধুমাত্র সাদাদের জন্য,’’, ‘‘কালো ’’ ইত্যাদি সাইন বোর্ড সর্বত্র ঝোলানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সব কিছুই ইতোমধ্যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আইনানুগ মর্যাদার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হয়। সাদা ও কালোদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। এই পৃথকীকরন আইনের আওতায় সাদা ও কালোদের জন্য আলাদা হাসপাতাল, জেলখানা, গোরস্থান নির্মান ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রবর্তন করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে হোটেল, নাট্যশালা, গ্রন্থাগার, লিফট ও গীর্জায়ও তা চালু করা হয়। এই বিচ্ছিন্নকরন সবচেয়ে গভীরভাবে স্কুল সমূহে পরিলক্ষিত হয় যা এই কালোদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদের জাতিগত সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সাদা-কালোর এই জাতিগত বৈষম্য ও পৃথকীকরনের সাথে সাথে সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কালো লোকদের বিনা বিচারে হত্যার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৯০ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে ১৩০০ কালো মানুষকে বিনা বিচারে **(Lynching)** নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ সময়ে বিভিন্ন কারনে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কালো লোকদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। আলোচ্য সময়ে বর্ণবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করে। এ বিষয়ে আমেরিকার জীববিদ্যা বিষয়ক বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত **R.B Bean** এর মাথার খুলির পরিমাপ বিষয়ক গবেষনার ফলাফলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া আমেরিকান জনগনকে নিয়ন্ত্রনহীন অভিভাষন থেকে সংরক্ষন করার অজুহাতে একটি নির্দিষ্ট ধরনের বর্ণবাদের উত্থান ঘটে। **Passing of the Great Race (1916)** নামক পুস্তকের লেখক **Madison Grants** লিখেছেন '' দুই প্রজাতির (সাদা ও কালো) আন্ত বিবাহের সন্তান অনুন্নত প্রজাতির চেয়েও নিকৃষ্ট প্রজাতির সৃষ্টি করবে।'' ''এ কারনে তিনি এই দুই ভিন্ন প্রজাতির বিবাহ নিষিদ্ধ করনের দাবী জানান। '' বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকাতেও বর্ণবাদ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ডারউইনবাদের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এ নীতিকে ঘোর সমর্থন করে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় বর্ণবাদীরা তাদের মতাদর্শ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সব সময় ডারউইনবাদকে তাদের শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করতো। এই মতবাদ প্রচারের পূর্বে এ ধরনের চিন্তা ও কার্যক্রমকে নিষ্ঠুর হিসাবে বিবেচিত হতো, কিন্তু ডারউইনবাদের তাত্ত্বিক সমর্থনের প্রেক্ষিতে এ সবই ''প্রাকৃতিক আইন'' হিসাবে গন্য করা হয়।

<u>ডারউইনের বর্ণবাদী ও অমানবিক নীতি</u>

<u>অষ্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের নিধন</u> ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের **Aborigines** বলা হয়। এ সকল আদিবাসী এ উপমহাদেশে হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের এ মহাদেশে অনুপ্রবেশের প্রেক্ষিতে আদিবাসীরা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নিধন যজ্ঞের শিকার হয়। যে মতাদর্শের ভিত্তিতে এ নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার নাম হলো ডারউইনবাদ। ডারউইনবাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি এই জনগোষ্ঠির বর্বরোচিত ও অমানবিক নির্যাতনের কারন ঘটায়। ১৮৭০ সালে বিবর্তনবাদী নৃতত্ত্ববিদ **Max Muller, Anthropological Review of London** পত্রিকার এক নিবন্ধে মানব সম্পদায়কে ৭টি প্রজাতিতে শ্রেনী বিন্যাস করেন। এই শ্রেনী বিন্যাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসাবে ইউরোপীয় শ্বেতাংগকে নির্ধারন করা হয় এবং সর্বনিম্ন প্রজাতি হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদেরকে চিহ্নিত করা হয়।

১৮৭৬ সালে বিখ্যাত সমসাময়িক ডারউইনবাদী **H. K Rusden, Aborigins** সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত উপস্থাপন করেন ঃ ''যোগ্যতমদের টিকে থাকার অর্থ হচ্ছে জোর যার মুল্লুক তার ''
তাই আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই অলংঘনীয় আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বিকার চিত্তে নীচু প্রজাতির অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও মাঁরে (নিউজিল্যান্ড এর আদিবাসী) প্রজাতিকে ধরা থেকে নিশ্চিহ্ন করার

ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আহবান জানাই। আমরা তাদের (আদিবাসীদের) পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত দুর্ভোগ শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করবো।''

১৮৯০ সালে রয়েল সোসাইটি অব তাসমানিয়ার **(Royal Society of Tasmania)** ভাইস প্রেসিডেন্ট **James Barnard** লিখেছেন, ''(আদিবাসীদের) নিধন প্রক্রিয়া বিবর্তনবাদের যোগ্যতমদের টিকে থাকার বিষয়টিও এক অলংঘনীয় প্রাকৃতিক বিধান। তাই এ অষ্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের হত্যা ও তাদের গৃহ ছাড়া করার ব্যাপারে কোন রকম নিন্দনীয় অবহেলা করা হচ্ছে বলে মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারন নাই।'' ডারউনবাদের এ ধরনের বর্ণবাদী নিষ্ঠুর নীতির কারনে আদিবাসীদের নৃশংসভাবে হত্যার এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। আদিবাসীদের কর্তিত মস্তক ষ্টেশনের দরজায় দরজায় টাংগিয়ে রাখা হতো। বিষ মিশ্রিত রুটি খাইয়ে আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন এলাকার আদিবাসীদের বসতি ৫০ বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

আদিবাসীদের হত্যার মাধ্যমেই এ নীতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় নাই বরং এ প্রজাতির অনেক সদস্যকে গবেষনার পশু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ওয়াশিংটন ডিসিস্হ **Smithsonian Institute** বিভিন্ন প্রজাতির ১৫০০০ ব্যক্তিকে সংরক্ষন করে। ১০০০০ অষ্ট্রেলিয় আদিবাসীকে জাহাজযোগে বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রেরণ করা হয় যাতে করে প্রানী থেকে মানবে উত্তোরন প্রক্রিয়ার **Missing Link** খুঁজে পাওয়া যায়।

যাদুঘর কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র হাড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি বরং এসব আদিবাসীদের মগজ সংরক্ষন করে তা উচ্চমূলে বিক্রয় করেন। তা ছাড়া এদেরকে হত্যা করে গবেষনাগারে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করার বহু প্রমান রয়েছে। এ ধরনের নিষ্ঠুর কর্মকান্ডের কিছু তথ্য প্রমান নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

Korah Wills, যিনি ১৮৬৬ সালে **Bowen, Queensland** এর মেয়র ছিলেন। তার মৃত্যু শয্যায় স্মৃতি বর্ননাকালে তিনি কিভাবে ১৮৬৫ সালে বৈজ্ঞানিক নমুনা সংগ্রহের জন্য একজন স্হানীয় গোত্রপতিকে হত্যা করে তার মৃত দেহ খন্ড-বিখন্ড করেন তার বিস্তারিত বর্ননা প্রদান করেন।

সিডনীর অষ্ট্রেলিয়ান যাদুঘরের **Australian Museum** এর কিউরেটর **Edward Ramsay,** যিনি ১৮৭৪ সাল থেকে ২০ বৎসর যাবত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এ ধরনের কাজে সিদ্ধহস্ত বা পারদর্শী ছিলেন। তিনি মিউজিয়ামের পুস্তিকা বা বুকলেট প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় আদিবাসীদের তথ্য সম্বলিত অষ্ট্রেলিয়ান প্রানী অধ্যায়ে **(Chapter)** এ **Australian Amimal** শিরোনামে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পুস্তিাকায় কবর থেকে মৃতদেহ সংগ্রহ ও কিভাবে মৃতদেহের শরীর থেকে বুলেটের চিহ্ন অপসারন করে নমুনা সংগ্রহ করার পদ্ধতি বর্ননা করা হয়।

Amale Dietrich (কালো মৃত্যু দূত হিসাবে কুখ্যাত) জার্মান বিবর্তনবাদী, অষ্ট্রেলিয়া আগমন করেন। তিনি স্হানীয় পশুপালনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কিছু আদিবাসীকে গুলি করে হত্যা করে নমূনা হিসাবে বিশেষ করে এদের মৃতদেহ ষ্টাফ **(Stuff)** করে যাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্হা করার প্রস্তাব দেন। এক জায়গা থেকে বহিস্কৃত হলেও তিনি এ নমূনাসহ জার্মানীতে ফেরত যান।

New South Walles এর যাজক এক ভয়াবহ হত্যা যজ্ঞোর স্বাক্ষী ছিলেন। কয়েক ডজন পুরুষ, নারী ও শিশু আদিবাসীদের অষ্ট্রেলিয় পুলিশ বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে। ৪৫ টি কাটা মস্তক সিদ্ধ করে এবং এর মধ্যে ভালো ১০টি মাথার খুলি বিদেশে জাহাজাত/রপ্তানী করার জন্য বাক্সবন্দী করা হয়।

বিংশ শতাব্দীতে আদিবাসীদের নিধন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে আদিবাসী শিশুদের বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা বেশ কার্যকর হিসাবে বিবেচিত ছিল।

১৯৯৭ সালের ২৮ এপ্রিল **Philadelpha Daily News** পত্রিকায় **Alan Thornhil** আদিবাসীদের পুনঃ গননা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

'' অষ্ট্রেলীয় আদিবাসীদের পুনঃ গননার মাধ্যমে পাকড়াও করা ''

এসোসিয়েটেড প্রেস ঃ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিমের সমভূমি এলাকায় বসবাসরত আদিবাসীরা তাদের শিশুদের প্রায় কয়লার কালি দিয়ে লেপন করত, যাতে রাষ্ট্রীয় সমাজ কল্যান কর্মী তাদেরকে না নিয়ে যেতে পারে। কল্যান কর্মীরা এ সব শিশুকে পেলেই তাদের ধরে নিয়ে যেত। অনেক বছর পর (এ ধরনের চোরাই শিশু) বলেন '' আমাদের লুকানোর উদ্দেশ্যে গলায় কয়লার ছোপ লেপন করা হতো ''

পশু খামারের একজন কর্মী যাকে শিশুকালে চুরি করা হয়েছিল বলেন, '' আমাদের বয়স যখন ৫/৬ বছর তখন আমাদেরকে **Moola Bulla** চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়। **Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission** এর '' বংশধারা চুরির অনুসন্ধান প্রতিবেদনে এ ধরনের হৃদয় বিদারক হাজার হাজার কাহিনী রয়েছে। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ১লক্ষ আদিবাসী শিশু সন্তান তাদের পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ ধরনের সাদা চামড়ার শিশুদের পাকড়াও করে শ্বেতাংগ পরিবারের প্রতিপালনের জন্য দেওয়া হয়। কালো চামড়ার শিশুদের এতিমখানায় প্রেরণ করা হতো।''

এমনকি বর্তমানেও এ বেদনা এত গভীর যে এ সমস্ত ঘটনা কমিশনের চুড়ান্ত প্রতিবেদনে বেনামে প্রকাশ করা হয়। '' তাদেরকে বাড়ীতে নিয়ে আসো'' এটাই সবার দাবী। কমিশন মত প্রকাশ করে যে, জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী তদানীন্তন সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড গণহত্যা হিসাবে বিবেচিত। তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চুবি/পাচারকৃত শিশুদের জন্য ক্ষতিপুরন প্রদানের বিষয়টি প্রতিপালন করতে সরকার অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, এ ধরনের ও জাতিগত নিধন সবই ডারউইনবাদের তত্ত্বের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে। আর তা হলো ''প্রাকৃতিক নির্বাচন'' তথা ''যোগ্যতমদের টিকে থাকা'' অষ্ট্রেলীয় আদিবাসীদের প্রতি যে নৃশংস আচরণ করা হয়েছে তা ডারউইনবাদের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের একটি খন্ড চিত্র মাত্র।

ওটা বেঙ্গা

The Origin of Species পুস্তকে বর্নিত ডারউনের দাবী মানুষ্য প্রজাতি ও বানর একই গোত্র থেকে উদ্ভুত। পরবর্তীতে এ দাবীর সমর্থনে জীবাশ্ম অনুসন্ধানের হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক বিবর্তনাবাদী বিশ্বাস করতেন ‘‘ অর্ধ বানর-অর্ধমানব ’’ প্রজাতির শুধু জীবাশ্মই নয় বরং এ ধরনের ‘‘জীব ’’ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে জীবিত অবস্হায় বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই **Missing Link** অনুন্ধানের কারনে বহু বর্বরোচিত কর্মকান্ড ঘটে। এ সব ঘটনার মধ্যে একটি হলো পিগমী **Ota Benga** । ১৯০৪ সালে বিবর্তনবাদী গবেষক **Samuel Verner,** কঙ্গো থেকে **Ota Benga** কে বন্দী করেন। মাতৃভাষায় এই নামের অর্থ হলো ‘‘বন্ধু।’’ **Ota Benga** ছিলেন বিবাহিত ও তার দুইজন সন্তান ছিল। অথচ তাকে পশুর মত শিকল পড়ানো হয় ও খাঁচার মধ্যে বন্দী করে আমেরিকায় পাঠানো হয়।

আমেরিকায় **St Louies World Fair** এ বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা তাকে বিভিন্ন প্রজাতির বানরদের সাথে খাঁচায় বন্দী করে মনুষ্য প্রজাতির ‘‘সবচেয়ে নিকটতম প্রানী ’’ হিসাবে প্রদর্শন করেন। দুই বছর পর তারা **Ota Benga** কে নিউইয়কের্র **Bronx** চিড়িয়াখানায় প্রেরন করা হয় যেখানে তাকে খাঁচায় বন্দী করে **Dinah** নামের একটি গরিলা, **Dohung** নামের একটি ওরাং ওটান ও কিছু শিম্পাজীর সাথে মানুষের সবচেয়ে প্রাচীনতম পূর্ব সুরী হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

চিড়িয়াখানার বিবর্তনবাদী পরিচালক **Dr. Willam T Horniday,** মনুষ্য প্রজাতির **Missing Link** সংগ্রহ করার বিরল কৃতিত্ব বর্ননা করে দর্শনার্থীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। দর্শনার্থীশন খাঁচায় বন্দী **Ota Benga** এর সাথে পশুর ন্যায় আচরন করেন। **New York Times** –এ পত্রিকায় দর্শনার্থীদের মনোভাব নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করা হয় ঃ

‘‘ চিড়িয়াখানায় ৪০,০০০ দর্শনার্থী উপস্হিত হয়। প্রায় প্রত্যেকটি পুরুষ মহিলা ও শিশু প্রধান আকর্ষন হিসাবে আফ্রিকার এই বন্য মানুষকে প্রত্যক্ষ করে। দর্শনার্থীগন **Ota Benga** কে সমস্ত দিন মাঠে তাড়া করে, চিৎকার করে, বিদ্রুপ করে, তীব্র চিৎকার ও হট্টগোল করতে থাকে। কেহ কেহ তার পাঁজরে গুঁতা মারে, কেহ কেহ নাচতে থাকে , সবাই তাকে উদ্দেশ্য করে হাস্য পরিহাস করতে থাকে।’’

১৯০৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর **New York Journal** পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করে উল্লেখ করে, যদিও এ সকল কর্মকান্ডের বিবর্তনবাদই প্রমানের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, তবুও এটা মানবতার প্রতি অবিচার ও নিষ্ঠুরতা। ঐ পত্রিকার ভাষায় ‘‘ এ সকল লোক (যাদুঘর কর্তৃপক্ষ) কোন রকম চিন্তা-ভাবনা বা প্রজ্ঞা বিবেচনা না করে আফ্রিকার একজন বামন মানবকে বানরের খাঁচায় পুরে প্রর্দশন করছে। সম্ভবত তারা ধারনা করছে এর মাধ্যমে তারা জনসাধারনকে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করছে। ‘‘প্রকৃতপক্ষে এর বাস্তব দিক হচ্ছে যে আফ্রিকান প্রজাতির একজন সদস্যকে বন্দী করে এ জাতির প্রতি অবজ্ঞা/পরিহাস করা। যদিও এদেশের সাদাদের তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত। বিশেষ করে সে যখন নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে। এটা একটা লজ্জা, ঘৃনা ও দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কারন প্রকৃতপক্ষে যে মহাশক্তি আমাদের সকলকে একই আত্মা ও অনুভূতি দিয়ে পৃথিবীতে

প্রেরন করেছেন, সেই একই মানুষের শারীরিক দূর্বলতা জনিত কারনে তাকে খাঁচায় পুরে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।''

The New York Daily Tribune এ বিবর্তনবাদের বাস্তব প্রমান দেখানোর উদ্দেশ্যে **Ota Benga** এর প্রদর্শনী সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চিড়িয়াখানার ডারউইনবাদী পরিচালকের আত্মপক্ষ সমর্থন করে, যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা নীতি বিবর্জিত। গত সপ্তাহে **New York Zoological park** এ একজন আফ্রিকান পিগমীকে ওরাং, ওটান এর সাথে খাঁচায় প্রদর্শন করার ঘটনাটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কেহ কেহ ঘোষনা করেন যে, এর মাধ্যমে চিড়িয়াখানার পরিচালক **Hornday** নিগ্রোদের সাথে বানর প্রজাতির গভীর মিল রয়েছে তা দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। **Dr. Hornday** তা অস্বীকার করে বলেছেন ''এই বামনটি খাঁচায় রাখা হয়েছে সেটাই তার জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক জায়গা। তা ছাড়া আমরা বুঝতেও পারছিনা যে তাকে আমরা আর কোথায়ই বা রাখতে পারি। সে কোনক্রমেই বন্দী নয়। তবে এটা কেউ বলবেনা যে তাকে কোন নজরদারী ব্যতীত মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত।''

Ota Benga কে গরিলাদের সাথে পশুদের মত খাঁচায় বন্দী করে প্রদর্শন করানোর বিষয়টি বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠন এ কার্যক্রম বন্ধ করার অনুরোধ জানান। তারা উল্লেখ করেন যে **Ota Benga** একজন মানব সন্তান তার সাথে এ ধরনের নিষ্ঠুর আচরন করা কোনক্রমেই সংগত নয়। এ ধরনের একটি আবেদনপত্র ১২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালের **New York Globe** এ প্রকাশিত হয় আবেদন পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

সম্পাদক মহোদয়,

আমি দক্ষিণে (আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্য সমূহ) বহু বৎসর বসবাস করেছি। এ কারনে যে আমি নিগ্রোদের বেশী পছন্দ করি তা নয় বরং আমি নিগ্রোদেরকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করি। এই মহানগরে কর্তৃপক্ষ কিভাবে **Bronx** চিড়িয়াখানায় একটি নিগ্রো বালককে বানরের খাঁচায় বন্দী করে প্রদর্শন করার মত লজ্জাজনক কাজ করার অনুমতি প্রদান করতে পারে। পিগমী বিষয়ক সকল কর্মকান্ডের অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

AER, New York, Sept 12.

Ota Benga এর সাথে মানবিক আচরণ করার জন্য একটি আবেদনের ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ

মানব ও বানর প্রদর্শনী ধর্মযাজকের অননুমোদন। বেভারেন্ড **Dr. Mac Arthur** মনে করেন যে, এ ধরনের প্রদর্শনী মানবতার জন্য অপমানজনক। এ ধরনের প্রদর্শনীর জন্য যে দায়ী সে আফ্রিকানদের সাথে সাথে নিজেকেও অপমান করেছে। তিনি আরো বলেন, এ ক্ষুদ্র মানব সন্তানকে পশুর মত মনে না করে তাকে বরং তাকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বিকাশের জন্য স্কুলে ভর্তি করে দেয়া উচিত। অন্য একজন ধর্মযাজক **Dr. Gilbert** বলেন, এই প্রদর্শনীটি ভয়াবহ ব্যাপার এবং তিনি **(Dr. Gilbert)** ও অন্যান্য যাজকগন **Dr. Mac Arthur** সাথে সাথে একই ঘটনা দেখতে চান তা হলো ঃ এই বুশম্যানকে বানরের খাঁচা থেকে মুক্ত করে অন্য কোথায় পাঠানে হয় ''

এ সব কিছুর শেষ হয় **Ota Benga** এর আত্মহত্যার মাধ্যমে। কিন্তু এখানেও একজন সাধারন মানুষের মৃত্যুর চেয়ে তা অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করে। ডারউইনবাদী বর্ণবাদের ব্যবহারিক দিক কত নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত হতে পারে এ ঘটনা তার একটি বাস্তব নমুনা।

মানবের শ্রেষ্ঠত্ব চরিত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, রক্তের বা বর্ণের মাধ্যমে নয়

ডারউইনবাদীদের দাবী অনুযায়ী মানুষ পুশদের একটি উন্নত সংস্করন এবং কিছু প্রজাতির উন্নতির বা বিকাশের পর্যায় সম্পূর্ন না হওয়ায় এ সমস্ত প্রজাতির লোক প্রায় পশু পর্যায়ের থাকার কারনে এ ধরনের প্রজাতি মানব সভ্যতার জন্য ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ। যে সকল ব্যক্তি ডারউইনের এ দাবী বা মতবাদ সমর্থন করে থাকেন। তারা অন্যান্য প্রজাতির মানুষের সাথে নিষ্ঠুর ও নির্যাতনমূলক আচরন করে থাকেন তাদেরকে কাঠিন পরিস্থিতিতে বসবাস করতে বাধ্য করেন এবং এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে নির্মূলও করেন।

Bryan Appleyard তার **Brave New Worlds** নামক পুস্তকে লেখক বর্ণবাদীদের স্বৈরাচারী মনোভাব নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যাখা করেছেন। ‘‘ যদি কেহ কোনক্রমে আপনাকে নীচতর প্রজাতি হিসাবে গন্য বা বিবেচনা করে তা বৈজ্ঞানিক অথবা কুসংস্কারমূলক যাই হোক না কেন সেক্ষেত্রে কোন সীমারেখা না রেখেই আপনার উপর যে নিষ্ঠুর আচরন করা হচ্ছে তা সম্পূর্ন ন্যায় সংগতভাবেই বিবেচনা করা হবে। কাউকে ‘‘ নীচু ’’ প্রজাতি হিসাবে বিশ্বাস করা হচ্ছে মর্মে কোন ব্যক্তিকে খারাপ, ভয়ংকর, এবং উচ্চতর প্রজাতির জন্য হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করার প্রথম পদক্ষেপ। কেহ কেহ আবার এ ধারনাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে সাধারনভাবে বিশ্বাস করতে পারেন যে সকল ‘‘নীচু’’ প্রজাতির সকল সদস্য ভয়ংকর কারন তারা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এ প্রেক্ষিতে তারা এদের জন্ম নিয়ন্ত্রন, (বন্ধ্যাকরন) বিবাহে নিষেধাজ্ঞা অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এ সমস্ত ‘‘নীচু’’ প্রজাতির আক্রমন থেকে মনুষ্যকুলকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে হত্যা করার সুপারিশ করতে পারেন।

সকল মানুষ একই প্রক্রিয়ায় ও উপাদানে সৃষ্টি। সকলকেই মহান আল্লাহতালা সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরানে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে এভাবে বর্ননা করা হয়েছে ঃ ‘‘ যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন সর্বোত্তমরূপে এবং কর্দম হতে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে। পরে উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং তাহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহার রুহ হইতে এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ন, চক্ষূ ও অন্তঃকরন তোমারা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সুরা সেজদা ৭-৯)।’’

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে জানা যায় যে, মনুষ্য প্রজাতি আল্লাহ কর্তৃক ফুকে দেয়া আত্মা তার নিজ দেহে ধারন করে। কোন রকম জাতিগত বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল মানুষ চিন্তা করে, অনুভব করে ভালবাসে, ব্যাথা পায়, উত্তেজিত বা আবেগ তাড়িত হয়, আবার সে প্রেমিক, হৃদয়বান, দয়ালু আবার সকল মানুষ অত্যাচার/নিপীড়নমূলক আচরন করতে পারে। এ কারনে যে সমস্ত মানুষ অন্য প্রজাতির জনগোষ্ঠিকে ‘‘ অর্ধ ও অনুন্নত প্রানী ’’ হিসাবে গন্য করে তাদের সাথে অমানবিক আচরন করে তাদেরকে নির্যাতন করে তাদেরকে শোষন করে এবং যারা এ ধরনের কর্মকান্ডকে সমর্থন করে

এবং এর স্বপক্ষে মিথ্যা প্রমান ও তত্ত্ব উপস্থাপন করে। তারা অজ্ঞতাবশতঃ কবীরা গুনাহে (মহা পাপ/ অপরাধ) লিপ্ত হয়।

আমাদের সামনে অনেক সমাজ রয়েছে, তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির পর্যায় আমাদের তুলনায় কিছুটা নীচু স্তরের। কিন্তু তাদের মধ্যেও সব ধরনের মানবিক গুনাবলী বিদ্যমান। তবে তাদের ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য যে ধরনের প্রকৌশলগত জ্ঞান ও যোগ্যতা দরকার তার ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তাদের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। আবার আবহাওয়াজনিত কারনে কিছু জনগোষ্ঠি ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে এবং বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে থাকে। এ কারনে বিশ্ব সভ্যতা থেকে আলাদা সাংস্কৃতিক পরিবেশে তারা বসবাস করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথা, ঐতিহ্য, অভ্যাস ও রীতিনীতিতে তারা সাধারন মানুষের ন্যায় আচার-আচরন করে থাকে। কিন্তু যারা বর্নবাদের সুবিধাভোগী, তারা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ডারউনবাদী তত্ত্বানুযায়ী এ সমস্ত মানুষকে 'অনুন্নতপ্রজাতির' মানুষ হিসাবে সাব্যস্ত করে, যদিও তারা কোন ব্যাপারে সাধারন মানুষ থেকে আলাদা নয়, অথচ তাদেরকে '' নিম্নতর প্রজাতি '' হিসাবে গন্য করে এমনকি তাদেরকে পশু পর্যায়ের বলেও মনে করে থাকে। এই ধারনার কারনে আমাদের সময়কালেও এমন লোকও রয়েছেন তারা এসব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির লোককে ঘৃনা ও হেয় প্রতিপন্ন করে, শুধুমাত্র এ কারনে যে, তারা পর্যাপ্ত পরিমানে ''উন্নত'' নয়। আল্লাহতালা বর্ণবাদকে সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষনা করেছেন। আল্লাহতালা মানুষকে বিভিন্ন বর্ণে এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে সৃষ্টি বৈচিত্র ও আল্লাহর নিপুণ শিল্পকলা প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে কোরনের ভাষায় তা নিম্নরূপ ঃ

'' তার (আল্লাহর) নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণবৈচিত্রে। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে''(সুরা রূম-২২)।'' আল্লাহর নিকট মানুষের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব তার চরিত্রে। তার সকল প্রকার গুনাহ ও পাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকার মধ্যে এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যা খোদাভীতি থেকে উদ্ভুত হয়। তাছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র খোদাভীতির উপর নির্ভরশীল যা দেহ বর্ণ বা চেহারার সৌন্দর্যের মাধ্যমে নিরূপিত হয়না। এ বিষয়টি কোরানের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

'' হে মানুষ, আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হইতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যাক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী বা খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন ও সমস্ত খবর রাখেন (সুরা আল হুজরাত- ১৩)।''

তৃতীয় অধ্যায়

ডারউইনবাদ ও ফ্যাসীবাদের সাথে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক আঁতাত

ডারউইনবাদের সাথে হিটলারের অশুভ ঐক্য

প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত শক্তি জার্মানীতে যুদ্ধোত্তর বিশৃংখলা হতে নাজীবাদের সৃষ্টি হয়। এই পার্টির নেতা ছিলেন, বদরাগী, একগুঁয়ে ও আক্রমনাত্মক চরিত্রের ব্যক্তি যার নাম হিটলার। হিটলারের বিশ্বদৃষ্টি ভংগীর ভিত্তি ছিল বর্ণবাদ। হিটলার বিশ্বাস করতেন, আর্য জাতি যা জার্মানীর মূল ভিত্তি। এই জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হতে ''শ্রেষ্ঠ '' তাই তারাই বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে শাসন করবে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, আর্য জাতি একটি বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে যা ১০০০ বছর স্থায়ী হবে। হিটলার তার এই বর্ণবাদী তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সমর্থন ডারউইনের বির্বতনবাদী তত্ত্বের মধ্যে খুঁজে পান। তার চিন্তাধারা বর্ণবাদী জার্মান ঐতিহাসিক **Heinrich von Treitschke** দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত। **Heinrich** ডারউইনের বিবর্তনবাদের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি তার বর্ণবাদী মতবাদের ভিত্তি হিসাবে ডারউইনবাদকে গ্রহন করেন। তিনি দাবী করতেন, কোন জাতি কেবলমাত্র ডারউইনের '' যোগ্যতমদের টিকে থাকার '' মতবাদ অনুযায়ী প্রচন্ড প্রতিযোগীতার মাধ্যমেই উন্নতি করতে পারে এবং তার অর্থ হচ্ছে ঃ অবশ্যম্ভাবী ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। তার ধারনা ছিল তরবারী দ্বারা বিজয়ই হচ্ছে বর্বরতা থেকে সভ্যতা ও অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানালোক নিয়ে আসার একটি পদ্ধতি। তিনি মনে করতেন, পীতবর্ণের জাতিসমূহের মধ্যে কোন শৈল্পিক জ্ঞান বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জ্ঞান বা ধারনা নাই। কালো মানুষদের এটি একটি অমোঘ বিধিলিপি যে তারা সম্পূর্ন স্বেচ্ছায় শ্বেতকায় জাতির সেবায় চিরস্থায়ীভাবে নিয়োজিত থাকবে।''

এদিকে **Hitler**, **Treitschke** এর মতোই ডারউইনবাদের বিশেষ করে ''টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম '' তত্ত্ব থেকে তার নিজস্ব মতাদর্শ বিকশিত করেছিলেন। তার কুখ্যাত পুস্তক **Mein Kampf (My Struggle)** "অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম মতবাদ'' দ্বারা প্রভাবিত। ডারউইনের ন্যায় হিটলারও অইউরোপীয় জনগোষ্ঠিকে বানর প্রজাতির অতিরিক্ত কিছু মনে করতেন না। তিনি বলতেন '' নরভিক জার্মান জাতিকে বাদ দিলে বাঁন্দরের নাচ ছাড়া কিছুই থাকবে না। '' ১৯৩৩ সালে **Nuremburg** এ নাজি পার্টির শোভাযাত্রায় তিনি ঘোষনা করেন '' একটি উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ(আর্য)প্রজাতি অনুন্নত বা নীচ প্রজাতির জনগনকে শাসন করবে, এটা একটি অধিকার যা আমরা প্রকৃতিতে দেখতে পাই এবং এটাই একমাত্র বোধগম্য ও যুক্তি সংগত অধিকার কারন এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।'' **Hitler** যিনি আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ তিনি এ শ্রেষ্ঠত্ব তিনি একটি প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার হিসাবে বিবেচনা করতেন।

Dr. Hentry M Morris ভূতপূর্ব **President of the Institute for Creation Research,** হিটলারের **Mein Kampf** বই থেকে উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করে বলেন, '' ইহুদি জাতি একটি মানবেতর

প্রজাতির জনগোষ্ঠি যা পূর্ব নির্ধারিত জন্মগত উত্তরাধিকার হিসাবে খারাপ, যেমন নাকি নরভিক জার্মান জাতিকে মহৎ কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতিহাস এমন একটি হাজার বছরের মহান সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবে। যার ভিত্তি হবে বিভিন্ন প্রজাতির মর্যাদা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্হা যা প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত।'' হিটলার মনে করতেন যে, মানুষ একটি অতি উন্নত প্রজাতির পশু, তাই তিনি মানব প্রজাতির অধিক উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং এ ধরনের তথাকথিত উন্নতির বিষয়টি নাজী আন্দোলনের চুঁড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ ছিল তাদের বিবেচনায় '' উন্নত '' জনগোষ্ঠি থেকে ''অনুন্নত'' প্রজাতির বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করা। এ ক্ষেত্রে নাজিবাদীরা ডারউইনবাদ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এ কাজে তারা **Eugenic** বা ''উন্নত মানব প্রজাতি উৎপন্ন করার মতবাদ'' গ্রহন করে। উন্নত মানব প্রজাতি প্রজননের মতবাদ ডারউইনবাদের মধ্যেই নিহিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হলো- অসুস্হ ও প্রতিবন্ধী লোকজনকে নির্মূল করা ও স্বাস্হ্যবান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত প্রজাতির মানুষ সৃষ্টি করা। এই বিকৃত তত্ত্বানুযায়ী পশুর ক্ষেত্রে যেমন স্বাস্হ্যবান পশুর সাথে মিলনের মাধ্যমে উন্নত পশু জন্ম নেয় অনুরূপভাবে মানব জাতিকে উন্নত করা সম্ভব এবং তা করা উচিতও বটে। ডারউইনবাদী চিন্তাবিদগনই বংশগত কারনে এই কর্মসূচীর ধারক ও বাহক। ইংল্যান্ডে এ কর্মসূচীর প্রধান ছিলেন চালর্স ডারউইনের চাচাত ভাই **Francies Galton** এবং তার পুত্র **Leonard Darwin**

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, '' উন্নত মনুষ্য প্রজনন পদ্ধতি '' **(Eugenic)** ডারউইনবাদ থেকে উদ্ভুত। প্রকৃতপক্ষে তখন এই মতবাদ বিষয়ক প্রচারনা বিশেষ গুরুত্বসহ প্রকাশ করা হয়। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অর্থ হচ্ছে মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত জাতের মানুষ তথা স্বীয় প্রজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তাকে কার্যত অস্বীকার করা। অর্থাৎ এই দায়িত্ব মানুষ কর্তৃক নিজে গ্রহন করা।

ওয়াশিংটন ইউনির্ভাসিটির চিকিৎসা বিষয়ক ঐতিহাসিক**(Medical Historian) Kenneth Ludmerer** উল্লেখ করেন যে, এই তত্ত্ব **Plato** এর **Republic** এর সময়কাল থেকেই চালু ছিল। তবে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ডারউনবাদের কারনে এ তত্ত্বে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। তিনি উল্লেখ করেন, '' উন্নত মানব জাতির প্রজননের ধারনা উনবিংশ শতকের চিন্তাধারা। এ সময়ে এ ভাবধারা বিকাশের একাধিক কারন বা উৎস রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারন হলো ডারউইনবাদ। **Eugenic** এ শব্দটির স্রষ্ট্রা **Francis Galton,** তার এ চিন্তাধারা সরাসরি ডারউনবাদের যুক্তিসংগত ও বর্ধিত সংস্করন, যা তার চাচাত ভাই **Charles Darwin** উত্থাপন করেছিলেন।

জার্মানীর প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী **Ernst Haeckel** জার্মানীতে এ মতাদর্শ সর্বপ্রথম প্রচার করেন। তিনি ডারউইনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন। বিবর্তনের সমর্থনে তিনি **Recaptulation** নামক একটি অভিনব তত্ত্ব প্রদান করেন তাহলো বিভিন্ন প্রজাতির জীবিত প্রানীর **Embyro** দেখতে একই রকম। পরবর্তীতে প্রমানিত হয় যে, **Haekel** মিথ্যা **Data** সরবরাহ করে তার তত্ত্ব উপস্হাপন করেছিলেন। **Haekel** একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রতারনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি **Eugenic** মতবাদের জোর প্রতারনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, প্রতিবন্ধী শিশুকে

জন্ম গ্রহনের সাথে সাথে হত্যা করা উচিত। এ প্রক্রিয়ায় সমাজে বিবর্তনের ধারা ত্বরান্বিত হবে। তিনি আরো দাবি করেন, কুষ্ঠরোগী, ক্যান্সারাক্রান্ত ও মানসিক রোগীদেরকে বেদনাহীন মৃত্যুর মাধ্যমে হত্যা করা উচিত, তা না হলে তারা সমাজের জন্য বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়া শ্লথ গতি সম্পন্ন হয়ে পড়বে। আমেরিকান গবেষক **George Stein** জার্মান বিজ্ঞানী **Hackel** বিবর্তনবাদের প্রতি তার অন্ধ আনুগত্যের বিষয়টি **American Scientist** নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, **Hackel** দাবী করেছেন ডারউইনবাদ সঠিক। মানবজাতি অব্যশই প্রানী জগত থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। ‘‘ এ ভাবেই জার্মানীতে ডারউহনবাদের দূর্ভাগ্যজনক পদচারনা শুরু হয়েছে। মানব জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব ডারউইনের মতে বির্বতনবাদের তথা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ ব্যাপারে অন্য কোন যুক্তি বা মত প্রকাশ করাই হচ্ছে কুসংস্কার তথা বাতিলযোগ্য ’’

Hackel ১৯১৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু তার মতাদর্শ নাজীরা উত্তরাধিকার স্বরূপ গ্রহন করে। এর অল্পদিন পরেই হিটলার ক্ষমতায় আরোহন করেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এই উন্নত ‘‘মানব প্রজনন কর্মসূচী’’ হাতে নেয়া হয়। **A. E. Wilder Smith** তাঁর বিখ্যাত **Man’s Origin Man’s Destiny** নামক পুস্তক হিটলারের ব্যবহৃত নিজস্ব ভাষায় এই কর্মসূচী এভাবে বর্ননা করেন ঃ

‘‘ জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রে জনগনের শরীর ও মন সম্পর্কে শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে। কিন্তু মানুষ বা ব্যক্তি নির্বাচনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন। অনুরূপভাবে মনুষ্য প্রজনন ক্ষেত্রে
কোন ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্হ তা নির্বাচন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের রয়েছে। এ কারনে রাষ্ট্র অবশ্যই এ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে নিষ্ঠুরভাবে অন্য কিছু বিবেচনা না করে শারীরিকভাবে দূর্বল বা প্রতিবন্ধী লোক জন্ম না হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করবে। মানব প্রজাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মাত্র ৬০০ বছর যাবত এ কর্মসূচী চালু করা হবে। এতে করে সমাজে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যগত উন্নতি ও বিকাশের মাধ্যমে সভ্যতার যে উন্নতি সাধিত হবে বর্তমানে তা ধারনা করাও সম্ভব নয় ’’ ‘‘যদি প্রজাতির সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ও উর্বর সদস্যদের চিহ্নিত করা যায় তাহলে একটি ‘‘অভিনব উন্নত জনগোষ্ঠি ’’ তৈরী করা সম্ভব হবে অন্যথায় এ ধরনের শারিরীক ও আধ্যাত্ম উন্নত ধরনের বীজ আমরা হারিয়ে ফেলবো।’’ হিটলারের এই নীতি বাস্তবায়নের স্বার্থে মানসিকভাবে অসুস্হ, জন্মান্ধ, পঙ্গু এবং জন্মগতভাবে দূর্বল তাদেরকে একটি বিশেষ বন্ধ্যাকরণ কেন্দ্রে বন্দী করে রাখা হতো। এধরনের লোক জার্মান বিশুদ্ধ জাতিগত সত্ত্বা ও প্রজাতির বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নতির জন্য প্রতিবন্ধক বা ক্ষতিকারক বীজানু হিসাবে গন্য করা হয়। হিটলারের গোপন নির্দেশে এসব লোকদের হত্যা করা হয়।

এ ধরনের হত্যাকান্ড অত্যন্ত যুক্তি সংগত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারন এ ধরনের জন্মগত দূর্বলতা সম্পন্ন লোকদের সমাজে বোঝা ও সমাজের জন্য ‘‘অলাভজনক ’’ হিসাবে গন্য করা হতো এবং প্রজাতিগত উন্নয়নে বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হতো। কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় ‘‘ নীচ ’’ বা ‘‘অনুন্নত’’ গ্রুপকে এই কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে অসুস্হ, বোবা, কালা, বয়স্ক লোক, জন্ডিস ও গুরুতর মানসিক রোগীদের এই ‘‘ গোপন হত্যাকান্ড ’’ কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে কালো এ্যাথলেট **Jesse Owens** চারটি সোনার মেডেল লাভ করেন। হিটলার অন্যান্য প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জানালেও **Jesse** -কে অভিনন্দন জানাতে অস্বীকৃতি জানান এবং দ্রুত ষ্টেডিয়াম ত্যাগ করে চলে যান। মহিলাদেরকে কোন কোন বিবর্তনবাদী পুরুষদের চেয়ে ‘‘ নীচু ’’ প্রজাতি হিসাবে গন্য করেন। **Dr. Robert Wartenberg** পরবর্তীতে **California** এর বিখ্যাত **Neurologist,** নারীদের ‘‘নীচ’’ প্রমান করার চেষ্টা করে উল্লেখ করেন যে, মহিলাদের যদি সংরক্ষণ না করা হয় তারা জীবিত থাকতে পারেনা। এ কারনে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যদি এই দূর্বল মহিলাদের দ্রুততার সাথে অপসারিত না করা (নির্মূল) হয় তাহলে ‘‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’’ মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় কম প্রযোজ্য হবে। ’’ এই চিন্তাধারা অনুযায়ী নাজি জার্মানীতে নারীদের জন্য কিছু কিছু পেশায় নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

ডারউইনবাদ ও **Eugenic** মতবাদের প্রায়োগিক উন্নয়নের পর জার্মানীর বর্ণবাদী বিজ্ঞানীরা প্রকাশ্যে সমাজের অনভিপ্রেত সদস্যদের হত্যা করার সুপারিশ করেন। এ সব বিজ্ঞানীদের একজন **Adolf Jost** সরাসরিভাবে চিকিৎসকদের এ ধরনের লোকদের হত্যা করার পরামর্শ দিয়ে একটি পুস্তক লিখেন। ১৮৯৫ সালে **Das Recht auf den Tod (The Right to Death)** নামক পুস্তকে **Jost** যুক্তি প্রদর্শন করেন যে ‘‘সামাজিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার স্বার্থে রাষ্ট্রকে অবশ্যই এসব লোকদের হত্যা করার দায়িত্ব নিতে হবে।’’ **Adolf Jost** হিটলারের একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। তাকে ৩০ বছরের পরেও রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা গিয়াছে। হিটলার বলেন, রাষ্ট্র অবশ্যই দেখবে যে শুধুমাত্র সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদের সন্তান হবে। অবশ্যই তাদেরকে অযোগ্য ঘোষনা করা হবে যারা দৃশ্যত অসুস্থ বা জন্মগতভাবে কোন রোগ বহন করছে, তারা যেন অন্য লোকদের রোগাক্রান্ত না করতে পারে তাদেরকে সমাজ থেকে অপসারন (হত্যা) করা হবে। ১৯৩৩ সালে প্রনীত এক আইনের আওতায় ৩৫০,০০০ জন মানসিকরোগী, ৩০,০০০ জিপসী, শত শত কালো শিশুকে বিভিন্ন পদ্ধতি তথা খোজাকরন, রঞ্জনরশ্মি, ইনজেকশন, যৌনাংগে ইলেকট্রিক শক দিয়ে বন্ধ্যাকরন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। একজন নাজী কর্মকর্তা বলেন, ‘‘নাজীবাদ হলো প্রায়োগিক জীব বিজ্ঞান ’’ তাছাড়া জার্মান জাতির উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে হিটলার **Eugenic** তত্ত্বের আরো একটি শর্ত পূরন করেন। তা হলো স্বর্ণকেশী নীল নয়নধারী পুরুষ ও মহিলাদের জার্মান প্রজাতির প্রতিনিধি হিসাবে নির্ধারন করা হয় এবং তাদের মিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা হয়। ১৯৩৫ সালে এ কাজের জন্য বিশেষ ধরনের খামার (তথা গণবেশ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সকল খামারে বর্ণবাদীদের শর্তপূরনকারী মহিলাদের সাথে এস এস কর্মকর্তাদের **(S S Officers)** (জার্মান বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) মিলন ঘটানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের অবৈধ সন্তানদের প্রতিপালনের ও ব্যবস্থা করা হয়। যাতে হিটলারের স্বপ্নের ১০০০ বছরের জার্মান সাম্রাজ্যের জন্য উপযুক্ত সৈনিক সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

নাজীদের আর্য বর্ণবাদী বিভ্রান্তি

নাজীবাদীরা ডারউইনবাদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ''আর্যরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি '' এ তত্ত্ব প্রমান করার চেষ্টায় অবতীর্ন হয়। ডারউইন প্রমান করেন যে, মানুষ যত বেশী উন্নত হবে তার মাথার খুলি তত বড় হতে থাকবে। নাজীবাদীরা এ মতবাদকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহন করে এবং মানুষের মাথার খুলির মাপ নিয়ে প্রদর্শন করতে থাকে যে জার্মান জাতি শ্রেষ্ঠ। জার্মানীতে আগত অন্যান্য প্রজাতির লোকের/জনগোষ্ঠির মাথার খুলির চেয়ে জার্মানীদের মাথার খুলি বড় সেটা তুলনা করার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়। মানুষের দাঁত, চোখ, চুল ও অন্যান্য অবয়ব অঙ্গ প্রত্যংগ বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করা হয়। যে সমস্ত লোক এ বিবেচনায় বা মানদন্ডে উপযুক্ত বিবেচিত না হলে তাদেরকে মানুষ প্রজনন কর্মসূচীর আওতায় নিধন করা হতো। এধরনের 'পাগলামী' ও নিষ্ঠুর কর্মকান্ড ডারউইনবাদী নীতির সামাজিক বাস্তবায়নের নামে করা হয়।

আমেরিকান ঐতিহাসিক **Michael Grodin** তাঁর পুস্তক **The Nazi Doctors and the Nuremberg Code** এ বাস্তবতা নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেন ঃ

'' আমি মনে করি বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যা করা হয়েছে তা নাজী আদর্শের সাথে সামাজিক ডারউইনবাদের এক অপূর্ব মিল ও সমন্বয় রয়েছে এবং প্রজাতিগত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান **(Racial Hygienc)** তারা এ সময় চালু করে (তা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন) চূড়ান্ত বিশ্লেষনে যা রয়েছে তা হলো ঃ

George Stein বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন, ''নাজীবাদ আর যাই হোক না কেন এটাই প্রথমবারে মতো একটি সুসংহত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে এমন একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করা, যা একটি পূর্নাঙ্গ জৈবনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ''জৈবনীতি'' ডারউইনবাদী বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে সম্পূর্ন সংগতিপুর্ন।''

প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী **Sir Arthur Keith** হিটলার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে উল্লেখ করেন, '' জার্মান ফুয়েবার (নেতা) একজন বিবর্তনবাদী। তিনি পরিকল্পিতভাবে জার্মানীতে বিবর্তনবাদী নীতি ও আর্দশ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন।'' **Darwin Before and After** পুস্তকের লেখক **Robert Clarke** বলেন, হিটলার সম্ভবত বাল্যকাল থেকেই বিবর্তনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ধারনা পোষন করেন, উচ্চতর প্রজাতি ''টিকে থাকার সংগ্রামে'' নীচ প্রজাতিকে পরাস্ত করে অধীন করে রাখে। ''নাজী জার্মানীর রাজনৈতিক দর্শন হিটলারের এই চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়।'' **Race and the Reich** নামক পুস্তকের লেখক **Joseph Tenenbaum** উল্লেখ করেন ''জার্মানীর রাজনৈতিক দর্শন এ বিশ্বাস থেকে নির্মিত হয় যে, বিবর্তনবাদী ভাবধারা উন্নতির মূলমন্ত্র, সংগ্রাম, নির্বাচন (প্রাকৃতিক) এবং ''যোগ্যতম টিকে থাকার তত্ত্বের ভিত্তিতে এসব কিছুই ডারউইনের বিবর্তনবাদের মূলমন্ত্র হিসাবে বিবেচিত।'' জার্মানীর সমাজ তাত্ত্বিক দর্শনে যা পূর্ব থেকে অংকুরিত ছিল। এভাবেই জার্মান জাতি বল

প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব শাসন করার জন্মগত অধিকারের মতবাদ সৃষ্টি হয়। তাই জার্মান সাম্রাজ্যও দূর্বল জাতি সত্ত্বার সাথে হাতুড়ী ও পেরেক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।''

নাজী নেতাদের মধ্যে হিটলার একাই শুধু এ বিবর্তনবাদের মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন না। **Henrich Himmler,** জার্মান গুপ্ত পুলিশ (গেষ্টাপো) বাহিনীর প্রধান বলেন, প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী ''যোগ্যতম টিকে থাকার সংগ্রাম'' এর নিজস্ব গতিতে চলবে। প্রকৃতপক্ষে সকল নাজী নেতৃবৃন্দরাই বিবর্তনবাদ ও জার্মান বর্ণবাদের ঘোর সমর্থক ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। অনুরূপভাবে জার্মান বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিগনও জার্মানীর কালো বৎসর গুলিতে এ মতবাদের অন্ধ অনুসারী ছিলেন।

হিটলারের ধর্মের প্রতি প্র.চন্ড ঘৃনা

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমর্থন করার পিছনে হিটলারের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ন কারন ছিল, তা হলো ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরূদ্ধে এটা ছিল একটি মারাত্মক হাতিয়ার বা অস্ত্র। ঐশী সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতি হিটলারের প্রচন্ড ঘৃনা ছিল। নৈতিক গুনাবলী যেমন দয়া, নম্রতা, মানবতা যা সকল ঐশী ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান নির্দেশ, এই নির্দেশাবলী ডারউইনবাদের নিষ্ঠুর ও যুদ্ধবাজে বিশ্বাসীদের আর্য বংশের শ্রেষ্ঠত্ব তথা জার্মান জাতির জন্য তাদের ধারনা অনুযায়ী উন্নতির জন্য একটি প্রবল বিরোধী শক্তি হিসাবে বিবেচিত হতো। এ কারনেই ১৯৩৩ সালে নাজিরা যখন ক্ষমতা দখল করে জার্মান সমাজ ব্যবস্থায় তারা তখন পূর্বের ন্যায় এক ধরনের মূর্তি পূজার **(Pagan)** প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বস্তিকা **(SWASTIKA)** যা প্রাচীন মূর্তি পুজার প্রতীক তারা রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে শুরু করে। বিবর্তনবাদ, প্যাগান সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসাবে নাজী রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে মিল খুঁজে পায়। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে মতামত রাখতে গিয়ে হিটলার এক স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেন যে ঃ

''সুসংগঠিত মিথ্যাচার (খৃষ্ট ধর্ম) অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী থাকতে হবে। আমি শৈশবকালেই মনে করতাম যে, ডিনামাইট দিয়ে ধর্মকে ধ্বংস করা উচিত। তখন থেকেই আমি বুঝতে শিখি এ ব্যাপারে খুব কমই গোপনীয়তার সুযোগ আছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি **St Peter** এর চেয়ার যা একটি দূর্বল বৃদ্ধের প্রতীক হিসাবে এখনও টিকে আছে কিছু সংখ্যক অভাগী বৃদ্ধা যার সামনে দাঁড়িয়ে/নতজানু হয়ে থাকে। যা হোক, স্বাস্থ্যবান যুবক শ্রেনী আমাদের পক্ষে আছে। পূর্বেও আমাদের জনগন কোন ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াই যথেষ্ট ভালভাবেই জীবন যাপন করেছে। আমার ছয় ডিভিশন এস এস**(S. S. Army)** সৈন্য রয়েছে তারা ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ন উদাসীন।'' হিটলারের ধর্মের প্রতি এই বীতশ্রদ্ধা সম্পর্কে **Daniel Gasman** তার পুস্তক **The Scientific Origins of National Socialism** এ লিখেছেন, হিটলার প্রথাগত ধর্মের বিরূদ্ধে এককভাবে জৈবিক বিবর্তনবাদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করতেন। তিনি বহুবার খৃষ্ট ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করেন এ কারনে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ডারউইনবাদী শিক্ষার পরিপন্থি। হিটলারের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতার প্রতীক হলো ছিল ডারউইনবাদ।

বিংশ শতাব্দীতে অগনিত ধ্বংস যজ্ঞের প্রধান কারন হলো হিটলার ও নাজীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি যারা প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মেই বিশ্বাস করতেন না। এ সব ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, মানব জাতি বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ''উন্নত প্রানী '' হিসাবে সৃষ্ট হয়েছে। তারা নিজেদেরকে দুর্দমনীয়, কাউকে কোন রকম জবাদিহিতা বা দায়বদ্ধতার উর্দ্ধে বিবেচনা করতেন। তাদের কোন ধরনের খোদা ভীতি ছিলনা, ছিলনা কোন পরকালের ভয়, তাদের নীতিহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কোন সীমারেখা ছিলনা। এ কারনেই তারা নিষ্ঠুরভাবে নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করতে সক্ষম হন। একটা সমাজ ব্যবস্থা যে মানব জাতির জন্য কত ধরনের নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরন হলো হিটলারের আমল। শুধুমাত্র হিটলারই নয় বরং আমরা পরবর্তীতে দেখব **Stalin, Mao, Polpot, Franco, Mussolini** ও অন্যান্য যারা বিশ শতকের বিশ্বকে রক্তস্নাত করেছেন তারা প্রত্যেকেই সম্পূর্নভাবে ধর্মহীন ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মহীনতা পৃথিবীতে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে এদের কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা গ্রহন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরানিক নৈতিক নির্দেশনা ও অনুমোদন অনুসরন করে চলেন, তারা সমাজের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা প্রাচুর্য ও একটি আলোকিত সমাজ নির্মান করে থাকেন। যারা আল্লাহর ধর্মের বিশ্বাসী তারা কখনও পৃথিবীর কোথাও কারো শান্তি বিঘ্নিত করেনা বরং তারা সব সময় দয়া, বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সহযোগীতার ব্যাপারে সমাজকে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

ডারউইনবাদী ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনী কর্তৃক সৃষ্ট দুর্ভোগ ও বিপর্যয়

হিটলার যেমন ডারউইনবাদের উপর ভিত্তি করে জার্মানীতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারন করেছিলেন। একইভাবে তার সমসাময়িক ও মিত্র **Benito Mussolini** ডারউইনবাদীদের দাবী ও মতাদর্শের ভিত্তিতে ইতালীকে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী ভাবধারায় পরিচালিত করেন। মুসোলিনী একজন ডারউইনবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সহিংসতা বিশ্ব ইতিহাসের প্রধান চালিকা শক্তি এবং যুদ্ধের মাধ্যমেই বিপ্লব সংঘটিত হয়। তার মতে ইংল্যান্ডের যুদ্ধের প্রতি অনীহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের প্রধান প্রমান।

মুসোলিনী ফরাসীদের আর্থিক সহায়তায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তার নাম ছিল **(II Popolu DIitalla The people of Italy)** এ পত্রিকার শিরোনামে তিনি যে প্রবচন ব্যবহার করেন তা হলো ঃ **" He who has iron will also have bread "** অর্থাৎ জনগনকে এ বার্তা দেওয়া হলো, রুটি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সমর শক্তির। মুসোলিনী তার ফ্যাসিষ্ট পার্টির প্রতীক হিসাবে কুঠার নির্ধারন করেন। কারন কুঠার হলো যুদ্ধ, সংঘাত ও মৃত্যুর প্রতীক। মুসোলিনীর চরিত্রের বৈশিষ্ট প্রত্যেক ফ্যাসিষ্টের মতো আক্রমনাত্মক ও আইন ভঙ্গকারী প্রবনতা। তার চরিত্র সম্পর্কে **Denis Mack Smith** একটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুসোলিনী অপরিবর্তনীয় বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে আক্রমনাত্মক মনোভাব, ও আইন লংঘন করার প্রবনতা তার মধ্যে লক্ষ্যনীয়। অন্যান্য

ডারউইনবাদী ফ্যাসিষ্টদের মতো মুসোলিনীর যুদ্ধংদেহী, আক্রমনাত্মক ও নিপীড়নমূলক নীতি সমূহ ব্যাপক হত্যাকান্ড ঘটায়। ফলে বহু পরিবারও গৃহহীন হয় এবং অনেক দেশ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়। ব্ল্যাক শার্ট **(Black Shirt)** নামক বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে হত্যা ও নির্যাতন চালানো হয়। এ ধরনের কর্মকান্ড শুধু তার নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অন্য দেশেও তা বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৩৫ সালে তিনি ইথিওপিয়া দখল করেন এবং ১৯৪১ সালে ১৫,০০০ লোক নিধন করা হয়। তিনি অনতিবিলম্বে ইথিওপিয়া দখলের ডারউইনবাদী তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। মুসোলিনী বলেন, যেহেতু ইথিওপিয়ার জনগন কালো তাই নীচু প্রজাতির। তাই ইতালীয়দের মতো শ্বেত জনগোষ্ঠি শাসক হওয়ার জন্য তাদের গর্ব করা উচিত। ইতালী, ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম দেশ লিবিয়া দখল করে। মুসোলিনীর সময়ে মুসলিমদের উপর হত্যা, নির্যাতন ও সহিংসতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ সালে মুসোলিনীর মৃত্যুর পর একটি চুক্তির মাধ্যমে ইতালীর এই দখলদারিত্বের শেষ হয়। এ সময়ে (১৯১১-১৯৪৭) ১.৫ মিলিয়ন মুসলমানকে শহীদ করা হয় এবং হাজার হাজার আহত ও পঙ্গু করা হয়।

মুসোলিনী তার নিষ্ঠুর, নির্যাতনমূলক আচরনের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি ফ্যাসিবাদ সমর্থন ও বাস্তবায়ন করতেন। এ সম্পর্কে তিনি এক বক্তৃতায় বলেন ঃ ফ্যাসিবাদ কোন উদারতাবাদ নয় বরং একনায়কতন্ত্র, জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণ করেনা বরং এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি প্রদান করে।

হিটলার ও মুসোলিনীর উদাহরনে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, ফ্যাসিবাদ যেখানে শক্তিধর ও নিষ্ঠুর তাই সঠিক যৌক্তিক ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত মতাদর্শে সফলতা ও উন্নয়নের প্রধান পদ্ধতি হলো নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, আক্রমনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ও সংঘাত। এ সবই হলো ডারউইনবাদের বাস্তব প্রয়োগ ও দাবীর সফল বাস্তবায়ন তা হলো- ''শক্তিশালী বাঁচবে বা টিকে থাকবে আর দূর্বল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'' এ প্রক্রিয়াই লক্ষ লক্ষ লোকের দূর্ভোগ বয়ে নিয়ে এসেছে।

স্পেনে ফ্যাসিষ্ট নেতা ফ্রাংকোর অত্যাচার

স্পেনের জেনারেলোসিমো ফ্রাংকো ছিলেন একজন অন্যতম ফ্যাসিষ্ট নেতা। তিনি বিংশ শতাব্দীতে স্পেনে মানুষের রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেন। ফ্রাংকো, হিটলার ও মুসোলিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় স্পেনে **FALANGIE** ফ্যাসীবাদ আন্দোলনের নামে গৃহযুদ্ধ শুরু করেন। তিনি স্পেনের জনগনের জন্য চরম দুর্ভোগ ও নির্যাতনের কারন ঘটান। ফলে স্পেনে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ভাই ও ভাই, পিতার বিরূদ্ধে পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গৃহযুদ্ধের সময় প্রতিদিন গড়ে রাজধানী মাদ্রিদে ২৫০ জন, বার্সোলোনীয় ১৫০ এবং সেভিলে ৮০ জন নিহত হতো। কাউকে কাউকে মাথার মধ্যে পেরেক ঠুকে হত্যা করা হতো। সমগ্র দেশে অমানবিক ও ব্যাপক গনহত্যা সংঘটিত হয়। উদাহরনস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মাদ্রিদের উত্তরে ক্ষুদ্র পাহাড় ঘেরা গ্রামে ৩১ জন গ্রামবাসীকে ফ্রাংকোকে ভোট না দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা

হয়। এদের মধ্যে ১৩ জন কে ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গ্রামের বাইরে নিয়ে এসে রাস্তার পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। ফ্যাসিবাদীরা সেভিলের **(Seville)** কাছে একটি শহরে প্রবেশ করে। ৩০০ জনকে হত্যা করে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ৮০০,০০০ লোক নিহত হয়, ২০০,০০০ জনকে জেনারেল ফ্রাংকোর নির্দেশে হত্যা করা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক আহত অথবা পঙ্গু হয়।

হিটলারকে তার অস্ত্র পরীক্ষার জন্য জেনারেল ফ্রাংকো গোয়েরনিকা শহরের জনগনকে (হত্যার জন্য) উপহার দেন

ফ্যাসিষ্ট ফ্রাংকোর এই গৃহযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনী ছিলেন সবচেয়ে বড় সমর্থনকারী। ফ্রাংকো তার মিত্রদের পুরস্কৃত করতে পিছপা হননি। তিনি মানব ইতিহাসে সবচেয়ে নিষ্ঠুর অমানবিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ফ্রাংকো **GUERNICA** নামক ছোট একটি শহর নাজীদের মারনাস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য হিটলারকে উপহার দেন (এই শহরের ধ্বংসযজ্ঞই পাবলো পিকাসোর বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর্ম গোয়েরনিকা)।

১৯৩৭ সালের ৫ মে নাজীদের নতুন বোমা গুয়েরনিকায় ফেলা হয়। শহরবাসীরা ঘুম থেকেই উঠতে উঠতেই বোমাবাজীর শিকার হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। শহরটি নাজীদের বোমারু বিমানের লক্ষ্য বস্তু করার জন্য ফ্রাংকো হিটলারকে উপহার দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা প্রকৃতপক্ষে সেই বিকৃত দর্শনের সৃষ্টি, যা মানুষকে গবেষনাগারে পশু হিসাবে গন্য করে। এই দর্শন যার জন্য হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরন করে শুধুমাত্র মারনাস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য। এর ফলে হাজার হাজার লোক নির্যাতিত, আহত, পঙ্গু ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনও হাজার হাজার লোক দূর্ভোগসহ বেঁচে আছেন। এ দর্শন মানবজাতিকে পশু ছাড়া অন্য কিছু বিবেচনা করেনা এবং যুদ্ধকে মানব জাতির উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হিসাবে নির্ধারন করে। তাই এ দর্শন বা এ ধরনের যে কোন চিন্তাধারা বা মতাদর্শ যতদিন বিদ্যমান থাকবে, গনহত্যা, নির্যাতন, উৎপীড়ন ও দূর্ভোগ মানব জাতির জন্য অবধারিত প্রক্রিয়া হিসাবে বিরাজমান থাকবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ডারউহনবাদের প্রস্তুতিমূলক ভুমিকা

প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক প্রফেসর **James Joll** তার পুস্তক **EURORE Since 1870** এ প্রথম মহাযুদ্ধের কারন ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন যে, তদানীন্তন ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের ডারউইনবাদী চিন্তাধারার ফসল হলো এ যুদ্ধ, তার ভাষায় ঃ

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, কিভাবে ডারউইনবাদী চিন্তাধারা/মতাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন যে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ববতী বছর সমূহে অধিকাংশ ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ আক্ষরিক অর্থেই ‘‘ অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ’’ ও ‘‘ যোগ্যতমদের টিকে থাকার ’’ মতবাদ বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, **Austo-**

Hungarian সমাজ্যের **Chief of Staff, Franz Baron Conrad Von Hoetzendorff** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন ঃ

মানবতাবাদী ধর্মসমূহ নৈতিক শিক্ষা ও দার্শনিক মতবাদ/তত্ত্ব অবশ্য মানুষের ''অস্তিত্বের সংগ্রাম '' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত স্কুল উপায়ে বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু এগুলি কখনও পৃথিবীর প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে পরিগনিত হয় না। এ বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস যা একটি মহান সঞ্চালন শক্তি হিসাবে রাষ্ট্র ও জন জীবনে আগমন করেছে। এটা হলো এক ধরনের বজ্রপাত বা ঝঞ্চা যা প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী তার দায়িত্ব অবশ্যই সম্পাদন করবে।'' এই ধরনের মতাদর্শের ধারক ও বাহক হিসাবে **Contard** এর অষ্টিয়ান রাজবংশ রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রনিধানযোগ্য।

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, এ ধরনের চিন্তাধারা শুধুমাত্র সমরনায়কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং সমাজ বিজ্ঞানী **Max Weber,** যিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ''অস্তিত্বের সংগ্রাম'' মতবাদের বাস্তবায়নের ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ছিলেন। তা ছাড়া **Kurt Reizler** জার্মান **Chancellor Theobald Von Bethmann Hollweg** এর একান্ত সচিব, ১৯১৪ সালে লিখেছেন, ''মানুষের মধ্যে চিরস্থায়ী ওচূড়ান্ত শত্রুতা একটি জন্মগত ব্যাপার। পারস্পরিক বিরোধ যা আমরা সমাজের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করি, এটা মানব চরিত্রের কোন বিকৃত দিক নয় বরং এটাই পৃথিবীর মূলসূত্র এবং জীবের নিজস্ব অস্তিত্বের সাথে জড়িত একটি ব্যাপার।''

Friedrich Von Bernhardi, প্রথম বিশ্বের একজন জার্মান সমরনায়ক ও জার্মান সামাজিক ডারউইনবাদী ও যুদ্ধের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তিনি বলেন ''যুদ্ধ মানব জাতির জন্য একটি জীব বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা। এটা এমন একটা প্রয়োজন যা ''প্রাকৃতিক সংগ্রামের '' বিভিন্ন দিক ও বিভাগের মধ্যে বিরাজিত। জীব বিজ্ঞানের দিক থেকে তা যথাযথ সিদ্ধান্ত, তবে এ সব সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের উপর সম্পূর্ন নির্ভরশীল।''

প্রথম মহাযুদ্ধের কারন হিসাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, ইউরোপীয় চিন্তাবিদ, সমরবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ধারনা ছিল যুদ্ধ, রক্তপাত, দূর্ভোগ একটি অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান। যে মতাদর্শ একটি প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে তা যে মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডারউইনের মতবাদ- ''জীবনের জন্য সংগ্রাম '' ও ''শ্রেষ্ঠ সুবিধাভোগী প্রজাতি''। **Bernarde** দুই বছর পর বলেন ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের মাধ্যমে একটি '' জৈব বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন '' **(Biological Development)** সাধন করার কথা ছিল তা শুরু হয়েছে। এর ফলে ৮ মিলিয়ন মৃত, শত শত শহর ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক আহত হয়েছে ও পঙ্গু হয়েছে। লোক গৃহহীন ও বেকার হয়েছে। আরো লক্ষ লক্ষ নাজী যুদ্ধের উৎস ডারউইনবাদীদের মধ্যে নিহিত। ২১ বৎসর পর শুরু হয় (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ) ফলে ৫০ মিলিয়ন লোক মৃত্যু বরণ করে। হিটলার প্রায়ই তার যুদ্ধ ও গনহত্যার নীতির সাথে ডারউইনবাদকে সম্পৃত্ত করেছেন। তিনি বিবেচনা করতেন যুদ্ধের মাধ্যমে শুধুমাত্র দূর্বল প্রজাতির জনগোষ্ঠিকে নিধন করা নয় বরং প্রভু প্রজাতির দূর্বল ব্যক্তিবর্গকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। নাজী জার্মানী যুদ্ধকে সব সময় প্রশংসার

সাথে বিবেচনা করতেন। তাদের বিকৃত চিন্তাধারায় ‘‘প্রজাতির উন্নয়নের’’ জন্য যুদ্ধ একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করতো।

ডারউইনবাদী **A.E Wiggam** ব্যাখ্যা করেন যে, যুদ্ধ মানুষকে উন্নত করে। হিটলার কর্তৃক তার সমরনীতি এ মতামতের ভিত্তিতেই প্রনয়ন করা হয়েছে। ১৯২২ সালে এক পুস্তকে উল্লেখ করা হয় ঃ

কোন এক সময়ে মানুষের মস্তিক তার ‘‘ চাচাত ভাই ’’ বানর থেকে সামান্য বেশী ছিল। কিন্তু লাথি, কামড়, যুদ্ধ ও শত্রুকে বুদ্ধির মাধ্যমে পরাজিত করে এবং এ সম্পর্কে যাদের কোন ধারনা/চেতনা এবং প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও শক্তি ছিলনা তারা মৃত্যুবরন করে। এ প্রক্রিয়ায় মানুষের মস্তিক যথেষ্ট উন্নত হয়েছে।

হিটলার **Wiggam** এর ন্যায় বিবর্তনবাদীদের সমর্থন পেতে থাকেন। এদের মতে যারা জীবিত থাকতে চান তাদের জন্য যুদ্ধ একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। হিটলার তার পুস্তক **Mein Kamipf** -এ লিখেছেন ঃ সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে সবলের সাথে দূর্বলের মধ্যে সংগ্রাম একটি স্থায়ী বিধান। এ প্রক্রিয়ায় সবলের বিজয় ও দূর্বলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এটা না হলে প্রকৃতির ধ্বংস/ক্ষয় অবধারিত যে বাঁচতে চাইবে তাকেই যুদ্ধ করতে হবে। এই বিশ্বে যেখানে সংগ্রাম একটি চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক বিধান। যে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নন তাঁর এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নাই। এ ছাড়া অন্য কোন রকম চিন্তাধারা প্রকৃতির সাথে পরিহাস করা ছাড়া আর কিছু নয়। ফলশ্রুতিতে দুঃখ, দুর্দশা, ব্যাধি মানব জাতিকে গ্রাস করবে।

ডারউইনবাদীদের দাবী অনুয়ায়ী টিকে থাকার সংগ্রামে শুধুমাত্র শক্তিধরই টিকে থাকে এবং এই প্রজাতি সতিকার বিকাশ লাভ করে। এর অর্থ হচ্ছে এই উন্নত প্রজাতি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। মানব জাতির উন্নয়নের জন্য যুদ্ধকে একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, হিটলারের ধারনা অনুযায়ী জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব হলো যুদ্ধের মাধ্যমে তার চেয়ে দূর্বল প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করা। যদিও জার্মান জাতির জন্য যুদ্ধ কোন নতুন বিষয় ছিল না তবুও এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা তাদের যুদ্ধবাজ নীতির অনুসরনের একটি প্রেরনাদায়ী শক্তি হিসাবে কাজ করে। হিটলার অন্যত্র দাবী করেছেন যে, আমরা যে মানব সভ্যতাকে জানি সার্বক্ষনিক যুদ্ধ ছাড়া তা টিকে থাকতে পারতো না।

HAECKEL এর যুদ্ধ সম্বন্ধে ধারনা ছিল যে, প্রাচীন গ্রীসের একটি নগর রাষ্ট্র **SPARTA** বর্বরোচিত যুদ্ধনীতি বাস্তবায়ন করা উচিত। তিনি লিখেছেন যে, **SPARTA** অধিবাসীদের নীতি অনুযায়ী সুস্বাস্হের অধিকারী ও সবল শিশু ব্যতীত অন্য সকলকে হত্যা করার নীতির মাধ্যমে তারা একটি শৌর্য বীর্যশালী জাতি হিসাবে পরিগনিত হয়েছিল। শূধুমাত্র জার্মানী নয় বরং সমগ্র ইউরোপে জনসংখ্যার প্রধান নিয়ামক হিসাবে যুদ্ধ কেই বিবেচনা করা হতো। জার্মান সমাজবাদী ডারউইনবাদী **Friedrich Vonrenhanbi** লিখেছেন যে, যুদ্ধ না হলে সমাজে দূর্বল এবং বিকৃত প্রজাতির লোকেরা তাদের আর্য এবং সংখ্যার শক্তিতে উন্নত প্রজাতির জনগোষ্ঠিকে কোনঠাসা করে ফেলবে তাই যুদ্ধের

প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে এর মাধ্যমে যোগ্যতমদের টিকে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরন। এ কারনেই যুদ্ধ একটি অপরিহার্য জৈবিক প্রক্রিয়া।

উল্লেখিত বিবরনী থেকে আমরা দেখতে পাই যে, হিটলার এবং তার নাজী মতাদর্শের সমর্থকগন ডারউইনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুদ্ধকে মানব জাতির মহাবিপর্যয়ের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ দায়ী চালস ডারউইন তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রফেসর **JERRY VERGMAN** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ডারউইনবাদের প্রভাব সম্পর্কে বলেন যে, প্রাপ্ত প্রমানাদি থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, জার্মান জাতির চিন্তা ও কার্যকলাপের মধ্যে ডারউইনবাদের প্রভাব প্রচন্ডভাবে লক্ষ্যনীয়। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারন হিসাবে ডারউইনবাদকে দায়ী করা যায়। এ যুদ্ধে ৪০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও ৬ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতি সাধিত সংঘটিত হয়। বিবর্তনবাদের সত্যতা সম্পর্কে হিটলার স্থির নিশ্চিত ছিলেন, তাই তিনি মানব জাতির ত্রানকর্তা হিসাবে বিবেচনা করতেন। একটি নতুন উন্নত তথা শ্রেষ্ঠ মানব জাতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে তিনি মানব সভ্যতাকে বিবর্তনবাদের সর্বোচ্চ বিকশিত পর্যায় নিয়ে যাবেন এটাই ছিল তার প্রত্যাশা।

এটা সত্য যে, ডারউইন তার এই মতবাদ প্রচার করার পূর্বে পৃথিবীতে অগনিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদের প্রভাবে বিশ্বে সর্বপ্রথম যুদ্ধের একটি মিথ্যা বৈজ্ঞানিক সমর্থন প্রদান করা হয়েছে। যুদ্ধ সংঘটনে ডারউইনবাদের নেতিবাচক ভুমিকা সম্পর্কে **MAX NORDAU "The Philosophy and Morals of War"** যা আমেরিকায় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীতে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সমর্থনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে চার্লস ডারউইন এই মতবাদ প্রবর্তনের সাথে তাদের চরিত্রের বর্বরোচিত, রক্তক্ষয়ী এবং হিংস্র চিন্তা-চেতনা যা ডারউইনবাদ তথা বিজ্ঞানের আবরনে ঢেকে দিয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশ শতাব্দীতে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, বিশ্ব অতীতে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা ছিলনা বরং বস্তুবাদী চিন্তাবিদ ডারউইন, কার্ল মার্কস ও ফ্রয়েডের চিন্তাধারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। ডারউইনবাদী তত্ত্বের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি এই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধকে মানব সভ্যতার জন্য যে একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করতেন। তারা এই উভয়যুদ্ধে ৬০ মিলিয়ন লোককে হত্যা করেছে।

নব্য নাজীগনের অপকর্ম

হিটলার ও মুসোলিনী যদিও ফ্যাসিবাদী শাসকদের সাথে কুখ্যাত **S S GESTAPO** অথবা **"Black shirt "**-দের কার্যকলাপ অতীতের ইতিহাস মনে হলেও নব্য নাজী সংগঠন সমূহ তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী এখন সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সম্প্রতিককালে বর্ণবাদী ও ফ্যাসিবাদী আন্দোলন পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে জার্মানীর নব্য ফ্যাসিবাদরাই অগ্রগামী। এই নব্য নাজীরা প্রকৃতপক্ষে বেকার, গুন্ডা, মাদকাসক্ত, রক্ত পিপাসু ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠি। এদের মধ্যে ফ্যাসিবাদী চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

নব্য নাজীদের সম্পর্কে খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে তাদের রক্ত পিপাসু এবং আক্রমনাত্মক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রক্ত পিপাসু, গর্ব এবং গোঁড়ামী **Facist Olympia Group** এর সদস্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই তিনটি শব্দের মধ্যেই যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়। বর্তমানে এই সংস্থায় ৩৫ হাজার সদস্য রয়েছে এবং প্রত্যেক সদস্যের চোখে ক্ষমতা আরোহনের এক দুর্দমনীয় ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই নব্য নাজীরা 'মহান' হিটলার ও অন্যান্য নেতাদের মতাদর্শ অর্থাৎ সামাজিক ডারউইনবাদের অনুসারী। তারা তাদের নাজী ও বর্ণবাদী মতাদর্শ প্রচারের জন্য যে ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে ডারউইন ও তার মতাদর্শের প্রশংসা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। কারন ডারউইনবাদ তাদের সকল অপকর্ম ও আন্দোলনের তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করে থাকে। এই সব ইন্টানেটের পাতায় পাতায় তারা ডারউইনবাদকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে করে মনে হতে পারে যে, এটি এমন একটি মতবাদ যা বিশ্বাসযোগ্য ও অবশ্য পালনীয়। যদিও আমরা জানি ডারউইনবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

এ সমস্ত খুন ও আক্রমন নব্য নাজীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সম্পন্ন করে থাকে। নব্য নাজীরা মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করতে খুব আনন্দ লাভ করে, তারা ভয় দেখায়, ছোট শিশুর উপর অত্যাচার করে। বিশেষ করে তুর্কীরা তাদের আক্রমনের অন্যতম শিকার। নব্য নাজীগন ইন্টারনেট় সাইটের প্রতিটি দিক থেকেই তুকীদের প্রতি তাদের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং বাস্তবে তা কার্যে পরিণত করে। নব্য নাজীদের ইন্টারনেট সাইটের তাদের এমন একটি উদ্বৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

''যদি এখন আমার হাতে ক্ষমতা থাকত তাহলে অধিকাংশ তুর্কীদেরকেই গ্যাস চেম্বারে ঢুকাইতাম।'' নব্য নাজীদের তুর্কীদের প্রতি এই শত্রুতার ভিত্তি ডারউইনবাদের মধ্যেই নিহিত আছে। নব্য নাজীবাদীদের বক্তব্যের সমর্থনে তুর্কীদের প্রতি শত্রুতা বা ঘৃনা সম্পর্কীত ডারউইনের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপন করে। এই অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় নব্য নাজীদের প্রতিষ্ঠিত কিছু ইন্টারনেট সাইটে তুর্কী জাতির প্রতি তাদের মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি নব্য নাজীদের তুর্কী এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠির প্রতি উৎপীড়ন ও নিপীড়ন সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালের ১২ আগষ্ট তুর্কী দৈনিক **Sabah** এ নব্য নাজীদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন আক্রমনের একটি তালিকা প্রকাশ করে। **THURINGEN** রাজ্যে **GERA** শহরে **ELRAHMAN** মসজিদের জানালা জুন মাসে ভাঙ্গা হয়। **Baden Wurttemberg** রাজ্যের **EPPingen** শহরের একটি তুর্কী মসজিদের দুইটি **Molotov** ককটেল নিক্ষেপ করা হয়।

Pinneberg এর **Utersen** আবাসিক এলাকায় অবস্থিত **Green Mosque**এ মলোটভ ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। **Meningen** এর একটি তুর্কীদের অধ্যূষিত বসতবাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। **Bocholt** এর অবস্থিত একটি তুর্কী কফি হাউস এবং লেবাননের অধিবাসী অধ্যূষিত বসত বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। ১৪ জন লোক আহত হয় এর মধ্যে ০১ জন গুরুতর আহত হয়। পূর্ব জার্মান শহর

CHEMNITZ -এ এক ইরাকী পরিবারের ৭মাস বয়সের শিশুকে মাটিতে ছুড়ে ফেলা হয় এবং শিশুটি গুরুতরভাবে আহত হয়।

এ ধরনের ন্যাককারজনক ঘটনা সম্প্রতিককালে আরো সংঘটিত হয়েছে। তুর্কীদের সম্পর্কে ডারউইনের পুর্বোল্লেখিত শত্রুতার বিষয়টি নব্য নাজীদের দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করে। ১৯৯২ সালের নভেম্বরে **MOLN** শহরে তুর্কীদের প্রতি আক্রমন, পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে **Solingen** শহরে ০৫ জন তুর্কীকে নব্য নাজীরা পুড়িয়ে হত্যা করে। জার্মান মিডিয়া এই ঘটনাকে হিটলার যুগের পরবর্তী সময়ের জঘন্যতম বর্ণবাদী হত্যাকান্ড হিসাবে আখ্যায়িত করে। পরবর্তী বছরগুলোতে এ ধরনের অনেক ঘটনার খবর পাওয়া যায়। তুর্কীদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং অনেক তুর্কীকে পিটিয়ে আহত করা হয়। এ ছাড়া গ্রীস, হল্যান্ডে এ ধরনের আক্রমনের ঘটনা ঘটে। একটি ঘটনায় তুর্কী মহিলাকে ০৫ সন্তানসহ হত্যা করা হয়। এই ঘটনার জন্য সংঘটিত শোক মিছিলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট **"SWASTIKA"** (স্বস্তিকা) সহ মৃত্যুর হুমকিসহ পত্র প্রেরণ করা হয়।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বর্ণবাদী আক্রমনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হলো। ডারউইন এবং ফ্যাসিবাদী হিটলারের উত্তরাধিকারীদের দ্বারাই এ ধরনের হত্যা এবং আক্রমনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। এ ধরনের অমানবিক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন যথেষ্ট নয়। প্রকৃত পক্ষে এ সব কর্মকান্ড বন্ধ করার জন্য আইনী প্রক্রিয়ার পাশাপাশি একটি আদর্শিক যুদ্ধ অপরিহার্য। এ সমস্ত আক্রমনাত্মক কর্মকান্ডের হোতারা 'বর্ণবাদ' কে প্রাকৃতিক আইন হিসাবে বিবেচনা করেন এবং ডারউইনবাদ যতদিন পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং ভিত্তিহীন হিসাবে তাদের কাছে প্রতীয়মান হবে ততদিন এসব কর্মকান্ড চলতেই থাকবে।

৪র্থ অধ্যায়

ডারউইনবাদ ঃ কমিউনিষ্ট বর্বোরোচিত আচরনের উৎস

বিংশ শতাব্দীতে যে মতাদর্শ মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বর্বরোচিত ও ক্ষতিকারক হিসাবে প্রমানিত হয়েছে। যেই মতাদর্শের নাম সমাজতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র যে দুজন জার্মান দার্শনিকদের মাধ্যমে এর সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে, তারা হচ্ছেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঞ্জেলস। এই মতাদর্শ পৃথিবীতে এত রক্তপাত ঘটায় যে নাজী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অত্যাচারকেও তা ম্লান করেছে। এই মতাদর্শ অগনিত নিরীহ লোককে হত্যা করেছে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সংঘাত, ভয়, হতাশা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে গ্রাস করেছে। এমনকি এখনও যদি কেহ ''লৌহ যবনিকা'' ও রাশিয়ার কথা উল্লেখ করে তখন জনমনে এমন এক ত্রাসের সমাজের কথা মনে হয়, সেখানে অন্ধকার, কুয়াশা এবং হতাশা জনপ্রানহীন রাস্তাঘাট, দুঃখ-কষ্ট ও এক ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। যদিও ১৯৯১ সলে রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে তবুও এর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। অনুমোদনহীন সমাজবাদী-মার্কসবাদীদের কিছু ব্যক্তি যতই মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন জড়বাদী দর্শন এবং সমাজবাদের অন্ধকার দিক এখনও পর্যন্ত জনগনকে প্রভাবিত করছে। প্রকৃতপক্ষে এই চিন্তাধারা ও মতাদর্শ মানব সমাজকে ধর্মহীন এবং নীতিহীন হিসাবে প্রতিপালন করে চলেছে।

এই মতাদর্শ যা পৃথিবীর সকল ভৌগলিক এলাকায় সন্ত্রাস ও সংঘাতের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আদিকালের একটি মতবাদের প্রতিনিধিত্বকারী মতাদর্শ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এটি এমন একটি বিশ্বাস যা বিবেচনা করে যে, পৃথিবীতে সকল ধরনের উন্নতি বা বিকাশ হলো দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ফসল। এই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে মার্কস এবং এঞ্জেলস পৃথিবীর সকল কর্মকান্ড পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন করেন। মার্কস দাবী করেন, মানব জাতির ইতিহাস হলো দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সংগ্রামের ইতিহাস। মানব জাতির বর্তমান সমস্যা হচ্ছে শ্রমিকদের সাথে পুঁজিপতিদের সংগ্রাম বা যুদ্ধ। শ্রমিক সম্প্রদায় অচিরেই বিপ্লবের মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী সমাজ গঠন করবে।

অন্যান্য জড়বাদী দার্শনিকদের ন্যায় সমাজতন্ত্রের এই দুই প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম সম্পর্কে একটি সুগভীর ঘৃনা পোষন করতেন। মার্কস এবং এঞ্জেলস দুজনে নাস্তিক্যবাদের অনুসারী ছিলেন এবং সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশাসনকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা একটি অপরিহার্য কার্যক্রম হিসাবে তারা বিবেচনা করতেন। কিন্তু মার্কস ও এঞ্জেলস এর এ মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ন ঘাটতি ছিল তা হলো ঃ ''ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের মতাদর্শকে একটি বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়া এবং যে ভয়ংকর তাত্ত্বিক সখ্যতা ও মিত্রতা মানব জাতির জন্য দুঃখ, বেদনা, হতাশা, দুর্দশা, গনহত্যা এবং ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের কারন ঘটায় এবং এই মতবাদই বিংশ শতাব্দীর সাথে অন্য সকল সময়কালের পার্থক্য সৃষ্টি করে। ডারউইন তার **Origin of Species** বইতে বিবর্তনবাদের যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, মার্কস ও এংগেলস প্রকৃতপক্ষে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য এ ধরনের

তত্ত্বের অনুসন্ধানে ছিলেন। চার্লস ডারউইন দাবী করেন যে, প্রত্যেকটি প্রানী টিকে থাকার সংগ্রাম অথবা দ্বান্দ্বিক সংগ্রামের মাধ্যমে টিকে থাকে। উপরন্তু তিনি (ডারউইন) সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব ও সকল প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাসকে অস্বীকার করেন। মার্কস এবং এঞ্জেলস এই ভাবধারা তথা মতাদর্শকে লুফে নেন।

মার্কস ও এঞ্জেলস এর ডারডইন প্রীতি

সমাজতন্ত্রের প্রচার ও প্রসারের জন্য ডারউইনবাদের অপরিহার্যতা জানা যায় এ ব্যাপারে তাদের মার্কস ও এঞ্জেলসের পত্রালাপ থেকে। ডারউইনের পূস্তক প্রকাশিত (১৮৫৯) হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই এঞ্জেলস মার্কসের কাছে এক পত্রে লিখেন

''ডারউইন যার পুস্তক **(The Origin of Species)** আমি এখন পড়ছি তা এক কথায় অপূর্ব ও চমৎকার।'' এর উত্তরে মার্কস ১৯ ডিসেম্বর ১৮৬০ সালে এঞ্জেলসকে লিখলেন; ''এই বইতে আমাদের মতাদর্শের প্রাকৃতিক ইতিহাসের মূল সূত্র বর্ননা করা হয়েছে।''

১৮৬১ সালের ১৬ জানুয়ারী মার্কস তার সমাজাবাদী বন্ধু **LASSALLE** কে লিখেন '' ডারউইনের পুস্তকটি আমার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ন কারন মানব ইতিহাসের শ্রেনী সংগ্রামের ভিত্তি তত্ত্ব সম্বলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব এ বইতে বর্ননা করা হয়েছে। '' এ থেকে সমাজবাদীদের নিকট বিবতর্নবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

মার্কস তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পুস্তক **DAS CAPITAL** ডারউইনের নামে উৎসর্গ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করনে মার্কস নিজেকে বৃটিশ প্রকৃতিবিদ ডারউইনের একজন ''একান্ত ভক্ত'' **(Sincere admirer)** হিসাবে উল্লেখ করেন।

অনুরূপভাবে এঞ্জেলস ও ডারউইনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ব্যক্ত করে উল্লেখ করেন যে, প্রকৃতি হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কার্যক্ষেত্র; তাই এটা অবশ্যই সঠিক যে, শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি দ্বান্দ্বিকভাবেই কাজ করে থাকে কোন আধিভৌতিক সত্তার মাধ্যমে নয়। এ ব্যাপারে ডারউইনের নামই অন্য সবার আগেই উল্লেখযোগ্য।

এঞ্জেলস, ডারউইন ও মার্কসকে সমানভাবে প্রশংসা করে বলেছেন যে, ডারউইন যেমন জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবর্তনাবাদের সূত্র আবিষ্কার করেছেন, মার্কসও অনুরূপভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিবর্তনবাদ আবিষ্কার করেছেন। এঞ্জেলস এর অন্য একটি লেখায় তিনি ডারউইনের ধর্ম বিরোধী এই মতবাদের গুরুত্ব বর্ননা করে উল্লেখ করেন যে, '' তিনি (ডারউইন) প্রকৃতিক বিকাশে আধ্যাত্মবাদ তথা ভাববাদী মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। কারন তিনি প্রমান করেছেন, জীব বিজ্ঞানের মাধ্যমে গাছ-পালা, প্রানী জগতে এবং সর্বশেষে মানব জাতি পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করেছে। তাছাড়া এঞ্জেলস ডারউইনের মতবাদ স্বীকার ও সমর্থন করে **"The Part Played by Labour in the Transition form APE to Man"**-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন।

আমেরিকান গবেষক **Cornway Zirckle** সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের তাৎক্ষনিকভাবে বিবর্তনবাদকে গ্রহন করার কারন উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

‘‘মার্কস ও এঞ্জেলস ডারউইনের **The Origin of Species** পুস্তকটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বিবর্তনবাদকে সমর্থন করতে থাকেন। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা এমন একটি মতবাদের অনুসন্ধানে ছিলেন যা মানবজাতির সৃষ্টিতে কোন অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। বিবর্তনবাদ তাদের জন্য এটাই সরবরাহ করে, যা তাদের বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তির সিড়ি ব্যাখ্যার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া ডারউইনের বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা অর্থাৎ বিবর্তন ‘‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের’’ মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে, যা সমাজবাদীদের একটি বিকল্প প্রপঞ্চ বা মতবাদ যা বিদ্যমান সকল প্রকার জীবনের বিকাশের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে।

Harper’s Magazine এর **Tom Bethell** মার্কসবাদের সাথে ডারউইনবাদের মৌলিক সংযোগ নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন ‘‘ মার্কস কোন অর্থনৈতিক কারনে ডারউইনের পুস্তকের অনুরাগী বা ভক্ত ছিলেন না বরং এর মূল কারন হচ্ছে ডারউইন যে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেন তা সম্পূর্নরূপে বস্তুবাদী এবং এ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন অদৃশ্য অজৈব বা আধ্যাত্মিক সত্ত্বার বাইরে কোন কিছুরঅস্তিত্বের স্বীকৃতি নাই। এ গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করে ডারউইন ও মার্কস অবশ্যই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী।

বর্তমানে ডারউইনবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যকার মিলের বিষয়টি একটি সর্বজনবিদিত সত্য হিসাবে বিবেচিত। কার্ল মার্কসের জীবনী গ্রন্থে এ মিল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা উদাহরন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘‘ডারউইনবাদ প্রকৃতপক্ষে এমন একটি সূত্র গ্রন্থি, যার জন্য মার্কসবাদের সমর্থনে সকল প্রকার তথ্য ও প্রমানাদি নিহিত আছে। ডারউইনের বির্বতনবাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার মার্কসবাদী দর্শনের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে এবং শ্রমিক শ্রেনীর ব্যাপক সমর্থন পেতে সাহায্য করে। মার্কস এঞ্জেলস ও লেনিন, ডারউইনের মতবাদকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং এর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। এভাবে উভয় মতবাদ প্রচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করে।

আমরা জানি মার্কস ও এঞ্জেলস ডারউইনের বিবর্তনবাদী যা একটি নাস্তিক্যবাদী বিশ্ব দৃষ্টি ভঙ্গীর বৈজ্ঞানিক সমর্থনদানকারী মতবাদ হিসাবে বিবেচনা করে খুবই আনন্দ পেতেন। কিন্তু এ ধরনের আনন্দ ছিল অসময়োচিত। কারন এ মতবাদ উনবিংশ শতকে প্রচার লাভ করে যখন বিজ্ঞান এমন এক আদিম পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমানাদির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হতো। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষনার উন্নতি সাধিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডারউইনবাদের ভুলভ্রান্তিও অকার্যকর প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ও বস্তুবাদী মতাদর্শের পতনের সাথে সাথে ডারউইনবাদের পতন ঘটে। সঠিক জানার জন্য পড়ুন **(The Evolution Deceit By Harun Yahya)**। যেহেতু বস্তুবাদী ও জড়বাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা জানতেন যে, ডারউইনবাদের পতন, ধ্বংস বা অকার্যকর বা অবৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রমানিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের মতবাদ মানব জাতির কাছে ব্যর্থ হিসাবে পর্যবসিত হবে এ বিবেচনায় তারা আধুনিক বিজ্ঞান গবেষনার ফলাফল যতদুর সম্ভব গোপন করার চেষ্টা করেন।

মার্কস, এঞ্জেলস এর অনুসারীদের ডারউইন প্রীতি

মার্কস ও এঞ্জেলস এর অনুসারীগন যারা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে আরও লক্ষ কোটি মানুষের জন্য সংঘাত ভয় ও বেদনার কারন হিসাবে ঘটিয়েছেন, তারা অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদ সমর্থন ও সমাজে কার্যকর করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃবন্দ মার্কস ও এঞ্জেলসের নীতি বাস্তবায়িত করেছিলেন তাদের সাথে বিবর্তনবাদীদের সংযোগ বা আদর্শগত মিলের বিষয়ে **John More** লিখেছেন '' সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার সাথে বিবর্তনবাদীদের মতাদর্শের গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

মার্কসের সমাজতন্ত্রের প্রকল্প লেনিনই রাশিয়ায় বাস্তবায়ন করেন। কমিউনিষ্ট বলশেভিক আন্দোলনের নেতা লেনিন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়া জারতন্ত্রের অবসান ঘটান। প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলের পর বলশেভিকরা যে ধরনের সুযোগ খুঁজছিল তা পেয়ে যায়। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিজমের অনুসারীরা রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে। বিপ্লবের পর রাশিয়ায ০৩ বৎসর ব্যাপী কমিউনিষ্ট ও জারপন্থীদের মধ্যে এক রক্তাক্ত গৃহ যুদ্ধের সূচনা হয়।

অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতাদের ন্যায় লেনিনও বস্তুবাদী দর্শনে ডারউইনের মতবাদকে ভিত্তি ভুমি হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। ডারউইনবাদের প্রতি লেনিনের দৃষ্টি ভঙ্গী তার এক বক্তব্যে প্রকাশ পায় যা নিম্নরূপ, ''ডারউইন এই বিশ্বাসের অবসান ঘটিয়েছেন যে প্রানী ও উদ্ভিত জগতের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। শুধুমাত্র তা '' দৈবাৎ'' সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ কোন অবদান বা অস্তিত্ব ডারউইন অস্বীকার করেছেন। লেনিনের পরে বলশেভিক নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি অগ্রগন্য ছিলেন তার নাম ছিল ট্রটস্কি তিনিও ডারউইনবাদকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনি ডারউইনবাদের প্রতি তার অনুরাগ নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন,

'' জৈব পদার্থের মধ্যে দ্বান্দিক বস্তুবাদের আবিষ্কার হচ্ছে ডারউইনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।'' ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব পৃথিবীর ইতিহাসের কুখ্যাত রক্ত লোলুপ স্বৈরতান্ত্রিকদের একজন **Stalin** এর হাতে ন্যস্ত হয়। তার ৩০ বছর ক্ষমতা থাকাকালীন সময়ে নির্দয় কমিউনিষ্ট মতাদর্শ বাস্তবায়নকারী নেতৃত্বের যা হওয়া উচিত, সেটিই প্রমানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। ষ্ট্যালিনের প্রথম গুরুত্বপূর্ন কাজ ছিল রাশিয়ার ৮০ % কৃষিজীবিদের জমি রাষ্ট্রীয়করন। ব্যক্তিগত মালিকানার অস্বীকৃতির নীতি চালুকরনের নামে সমস্ত ফসল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসা হয় এবং তা রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে এক ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লক্ষ লক্ষ লোক, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধরা এই দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। শুধুমাত্র ককেশাস অঞ্চলেই মৃতের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ।

ষ্ট্যালিনের নীতি বাস্তবায়নে বাধা দানকারী হাজার হাজার লোককে ষ্ট্যালিন সাইবেরিয়ায় ভয়াবহ শ্রম শিবিরে প্রেরন করেন। এ সমস্ত শ্রম শিবির ছিল প্রকৃতপক্ষে জেলখানা। এখানে কাজ করতে করতে অধিকাংশ লোকই মারা যেত। ফলে এ শিবিরগুলো বন্দীদের গোরস্থান হিসাবে পরিগণিত হত। অন্যদিকে ষ্ট্যালিনের গুপ্ত পুলিশের হাতে লক্ষ লক্ষ লোক নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়।

ক্রিমিয়াবাসী ও তুর্কীসহ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে রাশিয়ার দূরতম এলাকায় দেশান্তরে বাধ্য করা হয়। ষ্ট্যালিনের এ ধরনের রক্তাক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ২০ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিকগন উল্লেখ করেছেন যে এ ধরনের নিষ্ঠুর কর্মকান্ডে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন। বলা হয়ে থাকে ষ্ট্যালিন তার ক্রেমলিনের রাজপ্রাসাদে বসে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মৃত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তিদের তালিকা দেখে খুব খুশি হতেন। তার এ ধরনের বিকৃত মানসিকতা ছাড়াও জড়বাদী দর্শনের উপর বিশ্বাসের প্রভাবই তাকে নির্মম খুনীতে পরিনত করেছিল। ষ্ট্যালিনের নিজের ভাষায় এ দর্শনের (কমিউনিজম মতাদর্শ) মূল ভিত্তি হলো - ডারউইনের বিবর্তনবাদ। ডারউইনবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ ‘‘কোন রকম বিভ্রান্তি বা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই আমরা নির্ভুলভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দিতে চাই তা হলো- পৃথিবীর বয়স, ভূতাত্ত্বিক সৃষ্টি তত্ত্ব ও ডারউইনের মতাদর্শ তথা বিবর্তনবাদ ’’

ষ্ট্যালিনের জীবিত থাকাকালীন সময়ে তার এক বাল্যবন্ধু **G Glurdhdze** তার নাস্তিক হওয়ার ঘটনা বর্ননা করে একটি পুস্তক রচনা করেন **Land Marks in the Life of Stalin** –এ পুস্তকে তিনি লিখেছেন,

শৈশবে তিনি (ষ্ট্যালিন) যখন গীর্জার স্কুলে পড়াশুনা করতেন। তিনি বিদ্রুপাত্মক চিন্তাধারা ও বিশ্লেষনধর্মী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি চার্লস ডারউইনের পুস্তক পড়া শুরু করলেন এবং একজন নাস্তিক হয়ে গেলেন।’’ এই পুস্তকে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ‘‘ ষ্ট্যালিনের ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কারন তিনি নিজেই লেখককে বলেছেন, তা হলো ডারউইনের পুস্তক। ষ্ট্যালিন এই লেখককে ডারউইনের একটি পুস্তক উপহার দেন এবং তা পড়ার জন্য বাল্যবন্ধুকে চাপও প্রযোগ করেন।’’

ষ্ট্যালিনের ডারউইনাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ন নিদর্শন হলো তিনি ক্ষমতায় আরোহনের পর রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা তথা পাঠ সূচী থেকে **Mendel** জাতিগত তত্ত্বের রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি তথা বহিষ্কার। উল্লেখ্য এ মতবাদ বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান জগতে সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ হিসাবে গৃহীত হয়। এই বৈজ্ঞানিক মতবাদে **Lamark** এর মতবাদ কোন প্রানীর অর্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ পরবর্তী প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে আত্মপ্রকাশ বা বিকাশ লাভ করে। উল্লেখ্য, বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে বিশ্বের বিজ্ঞান জগত **Lamark** এর মতবাদ বাতিল হিসাবে ঘোষনা করে **MendeL** এর মতবাদ গ্রহন করেছে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক **Lysenko** পর্যবেক্ষন করেন যে, **Mendel** এর মতবাদ ডারউইনবাদের উপর একটি বিরাট আঘাত অর্থাৎ ডারউইনবাদের একটি বিরাট দূর্বলতা তুলে ধরে। বিষয়টি তিনি ষ্ট্যালিনকে অবহিত করেন। ষ্ট্যালিন রাশিয়ান ঐ বৈজ্ঞানিকের ভাবধারায় অত্যন্ত চমকৃত হন এবং তাকে রাশিয়ার বিজ্ঞান পরিষদের প্রধান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। তাই **Mendel** এর প্রজাতিগত তত্ত্ব ষ্ট্যালিনের মৃত্যুপর্যন্ত রাশিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক গবেষনা বা স্কুল কলেজে গ্রহন করা হয়নি। ষ্ট্যালিনের শাসনামলে রাশিয়া একটি ত্রাসের রাজত্বে পরিণত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক আতংকের মধ্যে বসবাস করতে থাকে। নিরপরাধী হওয়া সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে দেশান্তর বা

অকল্পনীয় শাস্তির শিকার হওয়ার ভয়ে, ভীত থেকে দিন যাপন করতে থাকে। শুধুমাত্র কমিউনিষ্ট নয়, ফ্যাসিবাদের ইতিহাসেও একই ধরনের চিন্তাধারা ও তার বাস্তবায়ন দেখতে পাওয়া যায়।

এটা একটি স্হির নিশ্চিত সত্য যে, লেনিন, ষ্ট্যালিন, মাওসেতুং, হিটলার ও মুসোলিনীর ন্যায় রক্ত লোলুপ নেতৃবৃন্দ ও তাদের মতাদর্শ একটি মাত্র উৎস থেকে উৎসারিত। যদিও তাদের পিছনে অন্য একটি দোষী পক্ষও রয়েছে। যা হোক এ নেতাদের এ ধরনের ভারসাম্যহীন ও অমানবিক আচরণ এবং যে কারনে এরা মানবতার বিরূদ্ধে অপরাধ সংগঠনের জন্য দায়ী সেটা একটি আপাতঃ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সমর্থন তাদের যুগিয়েছে তা হলো জড় বা বস্তুবাদী দর্শন ও ডারউইনবাদ।

মাওসেতুং ঃ ডারউইন ও কার্ল মার্কস এর চীনা দূত

রাশিয়ায় ষ্ট্যালিন যখন স্বৈরশাসক হিসাবে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করছিলেন তখন চীনে ডারউইনবাদের মতাদর্শে অন্য একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ গৃহ যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে মাওসেতুং এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করে। মাওসেতুং রাশিয়ার আদলে একই ধরনের নিপীড়নমূলক একটি রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলেন। মাওসেতুং এর কর্মকান্ডে ষ্ট্যালিন ব্যাপক সমর্থন প্রদান করেন। চীন অসংখ্য হত্যাযজ্ঞের একটি বধ্যভূমি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী বছর সমূহে মাওসেতুং এর যুবক সহকর্মীরা যারা **Red Guard** হিসাবে পরিচিতি লাভ করে, তারা চীনকে একটি ত্রাসের রাজত্বে পরিনত করে। মাও, চীনে যে রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র গঠন করেন সে সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষনায় বলেন,

''চীনা সমাজতন্ত্র ডারউইনও তার বিবর্তনবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। মাও ব্যক্তিগতভাবে মার্কসবাদী, নাস্তিক ও বিবর্তনবাদের প্রতি গভীর প্রত্যয়ী ছিলেন। **Great Leap Forward** আন্দোলনের প্রথম দিকে মাওসেতুং , ডারউইনবাদ এবং এর সমর্থনে লিখিত পুস্তক, প্রবন্ধ ও প্রকাশনা চীনা শিক্ষা ব্যবস্হায় বাধ্যতামূলক হিসাবে ঘোষনা করেন।

চীনা কমিউনিষ্টরা ক্ষমতায় আরোহনের পর বিবর্তনবাদকে তাদের মতাদর্শের ভিত্তি হিসাবে গ্রহন করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এর বহুপূর্ব থেকেই চীনা বুদ্ধিজীবিগন এ মতাদর্শ গ্রহন করেছিলেন। উনবিংশ শতকে চীন সম্পর্কে পাশ্চাত্যে ধারনা ছিল এটি হলো একটি ''ঘুমন্ত দৈত্য, বিচ্ছিন্ন ও প্রাচীন সাংস্কৃতিক কুসংস্কারে বিশ্বাসী একটি জাতি।'' এ সময়ে খুব কম সংখ্যক ইউরোপীয় ধারনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে চীনা বুদ্ধিজীবিগন অতি ব্যগ্রভাবে ডারউইনবাদী বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে তা একটি আশাব্যঞ্জক প্রগতিশীল ও পরিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হতে পারে। চীনা লেখক **Hu Shith (Living Philosopies,1931)** লিখেছেন যে, ১৮৯৮ সালে যখন **Thomas Huxley** এর পুস্তক **Evolution And Ethics** প্রকাশিত হলো, এটা তাৎক্ষনিকভাবে চীনা বুদ্ধিজীবিগনের প্রশংসা ও গ্রহনযোগ্যতা লাভ করল। ধনী ব্যক্তিরা এই বইয়ের সুলভ সংস্করন বের করলো যাতে সাধারণ লোকের কাছে তা তাড়াতাড়ি পৌছানো সম্ভব হয়।

এই চীনা বুদ্ধিজীবিরাই সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন ও বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এরা ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। চীন দেশের একটি সর্বশ্বেরবাদী দর্শন ও ইতিহাস থাকা

সত্ত্বেও তাদের পক্ষে ডারউইনবাদী ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তা তাদের জন্য কোন ধরনের প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয় নি। **New Scientist** পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে একজন কানাডীয় ডারউইনবাদী দার্শনিক **Michael Ruse,** বিংশ শতকের প্রথম দিককার চীনা পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখেছেন,

'' এ সকল ভাবধারা চীনদেশে তাৎক্ষনিকভাবে তার শিকড় গড়তে সক্ষম হলো। পাশ্চাত্যে বিবর্তনবাদের প্রতি যে সামাজিক বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল। চীনের চিন্তা ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডারউইনবাদকে চীনা হিসাবেই অভিহিত করা যায়। তাও বাদী(**Taoists**) ও নব্য কনফিউসিয়ান ধর্ম বিশ্বাসী ''মানুষকে'' এক ধরনের পদার্থ (**Thingness**) হিসাবেই বর্ননা করা হয়েছে। তাই আমাদের (ডারউইনবাদীদের) মানুষকে ''উন্নত প্রানী '' হওয়ার মতাদর্শটি চীনাদের জন্য কোন বড় ধরনের ''শক'' হিসাবে দেখা দেয়নি।''

বর্তমানে চীনের রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক নীতি হিসাবে এক ধরনের মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু ডারউইনবাদের বস্তুবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তাধারা (সাধারণ সামাজিক দর্শন) যা মাওসেতুং ও তার বিপ্লবী অনুসারীরা অর্জন করেছিলেন এরই ফসল বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। **Michael Ruse** এর উপরোক্ত মন্তব্য অনুযায়ী ডারউইনবাদের গভীর শিকড়ের উপস্থিতির কারনে চীনে সহজেই সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব হয়েছে। চীনা জনগন ডারউইনবাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে মাওসেতুং এর পক্ষালম্বন করে তার নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী হয়েছেন।

সমাজতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গেরিলা যুদ্ধ, রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদ, গৃহযুদ্ধ ও সংঘাতের কারন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তুরস্কও তার মধ্যে একটি। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে বিভিন্ন গ্রুপ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তুরস্কে সমাজতন্ত্রের অন্ধকার বিভিষীকাময় অধ্যায় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিল। ১৯৮০ সালের পর কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসীরা বর্তমান বিচ্ছিনতাবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে হাজার হাজার লোকের হত্যার কারন ঘটায়। এতে বহু কর্তব্যরত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যও মৃত্যুবরণ করেন।

কমিউনিষ্ট মতাদর্শ ও ডারউইনবাদ একই সমতালে ১৫০ বছর ধরে পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটিয়েছে। এমনকি বর্তমানেও কমিউনিজম, ডারউইনবাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক। পৃথিবীর যে কোন দেশে যারাই বিবর্তনবাদের সমর্থক তাদের প্রথম সারিতে সব সময় সমাজবাদীদেরই দেখতে পাওয়া যায়। কারন কার্ল মার্কস বলেছেন কমিউনিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তি ভূমিতে রয়েছে বিবর্তনবাদ। এটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে এক ধরনের মিথ্যা বৈজ্ঞানিক সমর্থন যোগায়।

ডারউইনবাদ ও সমাজতন্ত্রের মিত্রতার ভিত্তি ঃ ধর্মের প্রতি গভীর ঘৃনা

জড়বাদী ও কমিউনিষ্টদের, ডারউইনবাদের প্রতি আঁকড়ে ধরে থাকার প্রধান কারন হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের প্রতি সমর্থন। জড়বাদী দর্শনের ইতিহাসের সকল যুগেই বিদ্যমান ছিল। উনবিংশ শতক পর্যন্ত দার্শনিকদের এ চিন্তাধারা পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারন তখন পর্যন্ত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই ধর্মে আস্থাশীল ও স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জড়বাদী দর্শন ও বিবর্তনবাদী মতবাদ মনুষ্য সমাজে বাস্তবায়িত করা হলো। উনবিংশ শতকে ডারউইনবাদ,

ধর্মহীন জড়বাদী সাংস্কৃতিক ভিত্তি তার ভূমিকা রাখতে শুরু করে যার কুফল বিংশ শতাব্দীতে পূর্নভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

এই জড় দর্শনের ফসল হিসাবে যে বস্তুবাদী সংস্কৃতি গড়ে উঠে এটাই প্রকৃতপক্ষে দুইটি মহাযুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, এবং অগনিত গৃহ যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, গণহত্যা, গণনিশ্চিহ্নকরন ও হাজার হাজার বর্বরোচিত কর্মকান্ডের স্রষ্টা হিসাবে কাজ করে। এই ধ্বংস যজ্ঞে কোটি কোটি লোককে হত্যা করা হয়। লক্ষ লক্ষ লোককে নির্লজ্জ্বজনকভাবে নির্যাতন, নিগ্রহ ও জঘন্য আচরনের শিকার হতে হয়। ‘‘ সন্ত্রাসীরা ডারউইনবাদের জড়বাদী দর্শনের প্রভাবে হয়ে প্রভাবিত নিজেদেরকে পশুর অধঃস্তন পুরুষ হিসাবে বিবেচনা করে পাহাড় পর্বতে মানবেতর জীবন যাপনে উৎসাহী হয়ে উঠে। কোন রকম দ্বিতীয় চিন্তা না করে মুহূর্তের মধ্যে নিরপরাধ শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধকে খুন করতে দ্বিধা করেনা। তারা না নিজেদের সম্পর্কে, না অন্য কোন লোককে সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি- মানুষকে মন, আত্মা, বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রানী বলে গন্য করে না বরং একটি হিংস্র প্রানী, অন্য প্রানীর সাথে যেরূপ আচরন করে তারাও অনুরূপ আচরন করতে থাকে। ষ্ট্যালিনের নির্বিচারে ডজন ডজন চার্চ ও মসজিদ ধুলিসাৎ করার ঘটনার মাধ্যমে কমিউনিষ্টদের ধর্মের প্রতি অনীহার একটি উদাহরন হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

The Long War Against God এর লেখক **Henry Morris** খোদাদ্রোহীতার সাথে ডারউইনবাদের মিল তথা সংযোগ সম্পর্কে বলেন যে, ডারউইনবাদের কিছু বৈজ্ঞানিক ঘাটতি ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদে কথিত বৈজ্ঞানিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারনে এটা সব ধরনের ধর্মদ্রোহী পদ্ধতি ও সংস্কারকে উৎসাহিত করার সমর্থন যোগায়। এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে।

বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্টরা প্রতারিত হয়ে বিশ্বাস করতে থাকেন যে, এটা অবশ্যই সত্য। কারন কমিউনিষ্ট মতবাদ বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ‘‘সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও জড়বাদী দর্শনের সাথে ধর্মের বিরোধ বলশেভিক বিপ্লবের সময় চরম আকার ধারন করে। গীর্জা ও মসজিদ ধ্বংসস্তুপে পরিনত করা হয়।’’ নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে যাদের বাইরে রাখা হয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। যদিও সকল সমাজেই ধর্ম বিশ্বাসী লোকের অস্তিত্ব থাকে। তাদেরকে ধর্মীয় কাজে বাধা প্রদান করা হয়। ছুটির দিন হিসাবে রবিবারকে বাতিল করা হয়। কারন রবিবার খৃষ্টানদের উপাসনার জন্য নির্ধারিত। সাধারণ ছুটির ধারনা বাদ দেওয়া হয়। সবাইকে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং যে কোন দিনকে ছুটির দিন হিসাবে বিবেচনা করার বিধান চালু করা হয়। এটা কমিউনিষ্টরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বাতিল করার সংগ্রামের অংশ হিসাবে চালু করে। ১৯২৮ ও ১৯৩০ সালে ধর্মে বিশ্বাসীদের কর দশগুন বৃদ্ধি করা হয়। তাদের খাদ্যদ্রব্যের রেশন ও স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অর্থাৎ তারা সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার হারায়। তাদেরকে প্রায়ই গ্রেফতারের শিকার হতে হয়। চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং দেশান্তরে প্রেরণ করা হয়। ১৯৩৬ সালের মধ্যে প্রায় ৬৫ % মসজিদ ও ৭০ % গীর্জা ধ্বংস করা হয়।

কমিউনিষ্ট দেশ আলবেনিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর অবস্থান নেয়। এ দেশের নাস্তিক নেতা ছিলেন **Envr Hodja**। তিনি ১৯৬৭ তিনি সালে আলবেনিয়াকে প্রথম ‘‘ধর্মহীন’’ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষনা দেন। ধর্মে বিশ্বাসীদেরকে কোন কারন ছাড়াই জেলে কয়েদ করে রাখা হয়। এদের অনেককেই

কারাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৬৮ সালে দুই জন বিশপ ও ৫০০০ ধর্ম বিশ্বাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অনুরূপভাবে মুসলিমদের হত্যা করা হয়। মাসিক পত্রিকা **Nendori** তে ঘোষনা করা হয় যে, ২১৬৯ টি মসজিদ ও গীর্জা বন্ধ করা হয়। এর মধ্যে ক্যাথলিক উপাসানালয় ছিল ৩২৭ টি। কমিউনিষ্টদের এ সমস্ত কর্মকান্ড সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করেন যে, তারা এমন একটি সমাজ নির্মান করতে চায়, যা অন্ধভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করবে এবং ধর্মের কোন রকম নাম নিশানা থাকবে না। এ সমাজে শুধুমাত্র বস্তুবাদে বিশ্বাসী এবং বস্তুকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দরা জানতেন যে, তাদের ইচ্ছামত জনগনকে পরিচালিত করতে হলে এমন এক জনগোষ্ঠি তৈরী করা প্রয়োজন যেখানে মানুষ কাজ করবে কান্ডজ্ঞানহীন, অনুভূতিহীন মেশিনের মত। সর্বোপরি এদের হতে হবে আল্লাহতালার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠি। শুধুমাত্র তাহলেই তাদের চাহিদানুযায়ী এদেরকে দিয়ে সব ধরনের নিপীড়নমূলক ও হত্যাকান্ড ঘটানো সম্ভব হবে। নাস্তিক্যবাদী ডারউইনবাদ সব রকমের নির্যাতন, নিপীড়ন, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, নিষ্ঠুরতা ও হত্যা সমর্থন করে যদিও ধর্ম এসব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। যে সমস্ত মতাদর্শে মানুষের জীবনের কোন মূল্য আছে বলে বিবেচনা করে না, তারাই বিংশ শতকে মহানন্দে রক্তের বন্যা বইয়েছে। বিংশ শতকে নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ, গণহত্যা, বিদ্রোহ, সংগ্রাম ও সংঘাতের প্রধান কারন এটাই।

ডারউইনবাদী কমিউনিষ্টদের বিশ্বব্যাপী অত্যাচার ও সীমাহীন নির্যাতন

নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এ দুটো হলো মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের অত্যাবশ্যক হাতিয়ার। কার্ল মার্কস জীবিত থাকাকালীন সময়ে **Paris Commune** (১৮৪৮) বিদ্রোহে মার্কসবাদের পরীক্ষাকালীন সময়ে সন্ত্রাস ও সংঘাতের প্রতি তাদের দৃষ্টি ভংগী লক্ষনীয়। সন্ত্রাসবাদ, কমিউনিষ্ট মতবাদের এক অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত। বিশেষ করে মার্কসবাদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় লেনিন তা বিশেষভাবে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ লেনিন থেকে এই ধারা শুরু হয় এবং যা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। পৃথিবীর সব জায়গাতেই কমিউনিজম লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ত ঝরিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মাধ্যমে জনগনের দুঃখ-দুর্দশা, ভীতি, সন্ত্রাস ও সংগ্রামের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে সকল কমিউনিষ্ট নেতারাই তাদের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের জন্য স্মরনীয়। এতদসত্ত্বেও কোন কোন মহল এ ধরনের নিষ্ঠুর, ঠান্ডা মাথার হত্যাকারী, বিকৃতমনা, পীড়নকারীর ফটো দেওয়ালে টাংগিয়ে তাদেরকে নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন যা সত্যিই দুঃখজনক।

কমিউনিষ্টরা যদিও দাবী করে থাকেন, সন্ত্রাস ও সংঘাতের সাথে কমিউনিজমের কোন সম্পর্ক নাই। বরং এটা কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম। কমিউনিষ্টরা যতই তাদের দোষ অস্বীকার করার চেষ্টা করুক না, কেন এটা একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, কমিউনিজমের প্রবক্তরা সন্ত্রাসবাদের স্বপক্ষে মতামত ও যুক্তি প্রদর্শন করেছিল এবং তা তাদের আর্দশের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক বা অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **Samuel Francis** উল্লেখ করেন ঃ

মার্কস ও এঞ্জেলস সব সময়ই বলে এসেছেন, যে বিপ্লব সব সময় সংঘাতপূর্ন ও প্রচন্ড হতে হবে। বিপ্লবীদেরকে শাসক শ্রেনীর বিরুদ্ধে অতি আবশ্যই বল প্রয়োগ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনও করেছেন।

কার্ল মার্কস বলেন '' বিপ্লব যুদ্ধের ন্যায় উন্নতমানের কলা কৌশল ''এবং তিনি বিপ্লবী রাজনীতির একজন প্রান পুরুষ **Danton** ফরাসী বিপ্লবের এর একটি বিখ্যাত শ্লোগান- ''আক্রমন, আক্রমন ও পুনরায় আক্রমন'' ব্যবহার করেন।

লেনিনও সন্ত্রাসবাদের পরিকল্পিত প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বক্তব্য ও বিবৃতি প্রদান করছেন যার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃতি করা হলো ঃ

''প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে এক শ্রেনীর উপর অন্য শ্রেনী নির্যাতন চালায়। স্বৈরতন্ত্র এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা প্রত্যক্ষভাবে কোন আইনগত বিধিনিষেধ ছাড়া সম্পূর্নরূপে শক্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। শ্রমিক শ্রেনীর একনায়কতন্ত্র হলো এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা ধনিক শ্রেনীর উপর শ্রমিক শ্রেনীর সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ও সংরক্ষিত সরকার ব্যবস্থাপনা, যা, যে কোন ধরনের আইনী বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ন স্বাধীন। আমরা কোন মতেই রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বিরোধী নই।'' তবে তা সরাসরি গন আন্দোলনের সাথে জড়িত বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এ ব্যাপারে এটাই বিচার্য বিষয়। ক্ষমতা অর্জনের জন্য শ্রেনী সচেতন শ্রমিকরা অধিকাংশ লোকের সমর্থন আদায় করবে যতক্ষণ পর্যন্ত জনগনের প্রতি কোন নির্যাতন না করা হয় এবং ক্ষমতায় যাওয়ার অন্য কোন উপায় না থাকে। কোন এক কর্মী সমাবেশে তাদের আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন সম্পর্কে লেনিন যে ভয়াবহ বক্তৃতা দেন তা হলো ঃ

''যদি সাধারন জনতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে না জেগে উঠে তা হলে কোন কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা নাই যতদিন পর্যন্ত না আমরা আশাবাদীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা উচিত তা করতে ব্যর্থ হই- (তা হলো) তাদের মাথায় একটি বুলেট ঢুকিয়ে না দেই তাহলে আমরা কোন দিনই আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে সক্ষম হবো না।

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম একজন নেতা ট্রটস্কি, লেনিনের বক্তৃতার ব্যাখা করে বলেন যে, বিপ্লবের সাথে বিপ্লবী শ্রেনী তাদের কাছে যত ধরনের উপায় ও পন্থা রয়েছে সবগুলির সদ্বব্যবহার করবে- প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র বিপ্লবের ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে।'' ট্রটস্কি বক্তৃতায় এক ধাপ বেশী এগিয়ে বলেন ঃ ''বর্তমানে আমাদের একমাত্র পছন্দ হলো গৃহযুদ্ধ। এ গৃহযুদ্ধ রুটির জন্য যুদ্ধ। গৃহযুদ্ধ দীর্ঘজীবি হোক ।'' রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে লেনিন ও ট্রটস্কি এর মত তাত্ত্বিকদের নীতি ও মতাদর্শ কার্যে পরিনত করা হয়। ১৯১৭ সালের শরৎকালীন বিপ্লবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞে লুটপাট ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের সূচনা হয়। এ সময় যারা এ বিপ্লবের বিরোধী ছিল বা যাদেরকে বিপ্লব বিরোধী হিসাবে মনে করা হতো। তাদেরকে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার করে গুলি করে হত্যা করা হতো। তাদের গৃহে লুটতরাজ করে ধ্বংস করে ফেলা হতো। সন্ত্রাসবাদ, লেনিন ও ট্রটস্কির আমলে শুরু হলেও ষ্ট্যালিনের

শাসনামলে এটা সবচেয়ে জঘন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সোভিয়েত কারাগারগুলি সম্পর্কে বর্ননা করে **The New York Times** এর এ **Harison E Salisbury** লিখেছেন যে ঃ সমগ্র মহাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। এ বিপ্লবের হোতারা হাজার হাজার হত্যাকান্ড লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটায়, এই সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি ‘‘ ত্রাস ব্যবস্থা ” **Soviet Terror System** হিসাবেই বিবেচনা করা যায় এর তুলনায় জারতন্ত্র অনেক সহনীয় ও মানবিক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

আমরা বিচলিত হয়ে যাই, যখন দেখা যায় একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দৈনন্দিন নিয়মিত অপকর্ম তথা নিষ্ঠুর আচরনের মাধ্যমে প্রতি বছর ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন লোককে কায়িক শ্রমে বাধ্য করা ও চিরস্থায়ী দেশান্তরে প্রেরন করা হয়। এধরনের কার্যক্রমকে এমন স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় যে, বন্দীরা জানতেও পারতনা তাদের অপরাধই কি এবং তাদের বিরূদ্ধে কি রায়ই বা দেওয়া হয়েছে।

ক্রিমিয়ার তুর্কী, মধ্য এশিয়ার তুর্কী ও কাজাক জনগোষ্ঠি বিশেভাবে এই সোভিয়েত পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসের নির্মম শিকার হতে হয়। **Troiki** নামের বিশেষ আদালতের মাধ্যমে রাশিয়ান সমাজকে কাজাক জনগোষ্ঠি থেকে বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২০ সালে শুধুমাত্র অক্টোবরেই **Troiki** ৬০০০ জনকে মৃত্যু দন্ডারোপ করে যা অবিলম্বে কার্যকরী করা হয়। এ সরকারের যারা বিরোধীতা করেছিল তাদের পরিবারকে গ্রেফতার করা হয়, এমনকি তাদের প্রতিবেশীদের পরিকল্পিতভাবে জিম্মী করা হয় এবং কনসেন্ট্রেশন **(Concentration Camp)** ক্যাম্পে পাঠানো হয়। **Ukraine -** অবস্থিত এ ধরনের একটি ক্যাম্পের প্রধান **Martrin Latis** তার একটি প্রতিবেদনে স্বীকার করেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল মৃত্যু ক্যাম্প। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ঃ **Maikop** এর নিকটে অবস্থিত একটি ক্যাম্পে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হতো। অক্টোবরে প্রচন্ড শীত ও কাদায় তারা মাছির মত মারা যায়। এ সব মহিলা বাঁচার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। যে সব সৈনিক এদের পাহারার কাজে নিয়োজিত ছিল তারা এ পরিস্থিতির পূর্ন সুযোগ গ্রহন করে মহিলা বন্দীদের সাথে বেশ্যার ন্যায় ব্যবহার করতো।

ডারউইনবাদের প্রভাবে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা জনসাধারনকে পাগলের মতো হত্যা করতো। সমসাময়িক দালিলিক প্রমানের মাধ্যমে জানা যায়, এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ন নিধন। তাদের ধারনা ছিল যত বেশী সংখ্যক লোককে হত্যা করা হবে তাদের সফলতার হার তত বেশী হবে। তাদের বিবেচনায় বিপ্লবের বিরোধী প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল ঃ **Pyatigorsk Cheka (Extraordinary Committee for war Against the Counter Revolution)** প্রতিদিন ৩০০ লোককে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। তারা শহরগুলিতে বিভিন্ন মহল্লায় ভাগ করে এবং প্রতিটি মহল্লা থেকে নির্ধারিত সংখ্যক লোককে হত্যার তালিকা প্রস্তুত করতো। **Kislouodsk** শহরে কোন সুন্দর বিকল্প প্রস্তাব না থাকায় হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত ও কার্যে পরিনত করা হয়। **Krasnyi Mech (The Red Sword)** নামক কমিউনিষ্টদের পত্রিকার প্রধান নিবন্ধে **(Lead Article)** বলা হয় যে, কমিউনিষ্টরা যা খুশী তাই করার ক্ষমতা রাখে এবং বিশ্বাস করে যে, লাল রক্ত

না ঝরালে লাল আন্দোলন সফল হবে না। আমাদের কাছে সব কিছুই গ্রহনযোগ্য কারন আমরাই বিশ্বে প্রথম অত্যাচার নয় দাসত্ব নয় বরং মানব জাতিকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র ধারন করেছি। তাই রক্ত পানির মত প্রবাহিত হতে হবে। বুর্জূয়াদের কালো পতাকা (জলদস্যু হিসাবে আখ্যায়িত) রক্তে রঞ্জিত হয় আর আমাদের লাল পতাকা চিরদিন লাল থাকে। পুরানো পৃথিবীর মৃর্ত্যুর মাধ্যমেই আমরা আমাদের মুক্ত বা স্বাধীন করেছি যাতে শৃগালরা (পুরানো শাসকরা) আর ফিরে আসতে না পারে।

ষ্ট্যালিন এ ধরনের নির্যাতন ছাড়াও **“Requisiting detachment”** নামে এক বিশেষ ইউনিট গড়ে তোলেন। যেখানে কৃষকদের বল প্রয়োগের মাধ্যমে শস্য ফলানো হতো। এ ধরনের ইউনিটের কর্মকর্তাগন সকল প্রকার নির্যাতন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল।

১৯২২ সালের ১৪ ফ্রেক্রয়ারী এ ধরনের ইউনিটের একজন পরিদর্শক লিখেন যে ঃ এই বিশেষ ইউনিটের ক্ষমতা অপব্যবহারের মাত্রা সত্যিকারভাবে অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছেছে, গ্রেপ্তারকৃত কৃষকদের গোলাবাড়ির ঠান্ডায় রাখা হয়। পরবর্তীতে তাদের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে প্রচন্ডভাবে চবকানো হয়। যে সমস্ত কৃষক নির্ধারিত পরিমান শস্য উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাদের জোরপূর্বক উলংগ করে গ্রামের প্রধান সড়কে ঘোরানো হয় এবং অন্য একটি ঠান্ডা হ্যংগারে বন্দী করে রাখা হয়। বহু সংখ্যক মহিলাকে বেহুশ না হওয়া পর্যন্ত প্রচন্ডভাবে প্রহার করা হয় এবং পরে উলংগ করে বরফের মধ্যে গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়।

ষ্ট্যালিন বিশ্বাস করতেন যে, স্পেন রাশিয়ানদের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ বয়ে নিয়ে আসবে, যে কারনে তিনি স্পেনের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে কমিউনিষ্টদের সমর্থন দেন। রাশিয়ার এ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড স্পেনেও আমদানী করা হয়।

নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার একটি উদাহরন হলো- একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যেখানে ২০০ ষ্ট্যালিন বিরোধীকে ১৯৩৮ সালে বন্দী করা হয়। ষ্ট্যালিনের সমর্থকরা যখন **CHEKA** প্রতিষ্ঠা করলো তাদের নির্যাতনের জৈনেক ভুক্ত বর্ননা করেন যে ঃ কাছাকাছি অবস্থিত একটি কবরস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলো। **Chekists**-দের একটি নারকীয়/পৈশাচিক পরিকল্পনা ছিল- তারা কবরস্থানের সমাধি প্রস্তর খুলে মৃতের কংকাল, হাড়গোড় ও পঁচাগলা শরীর পুরোপুরি প্রত্যক্ষ করবে এবং এখানেই সবচেয়ে কঠোর প্রকৃতির লোকদের বন্দী করে রাখবে। তাদের নির্যাতনের বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর পদ্ধতি ছিল। কিছু কিছু বন্দীকে মাথা নিচের দিকে রেখে সমস্ত দিন রেখে দিত। অন্যদেরকে কার্বাডের মধ্যে বন্দী করে রাখত। তাতে শুধু নিশ্বাস নেওয়ার জন্য একটি ছিদ্র করে রাখত। সবচেয়ে জঘন্য পদ্ধতি ছিল ‘‘ড্রয়ার ’’ পদ্ধতি বন্দীদের একটি ছোট চৌকাঠের মাঝে আসন পিঁড়ি পদ্ধতিতে বাধ্য করে। অনেকদিন পর্যন্ত এ অবস্থায় বন্দী করে রাখা কাউকে কাউকে আবার ৮/১০ দিন যাবৎ কোন রকম নাড়াচাড়া করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বন্দী করে রেখে দেয়া হয়।

বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রীদের নির্যাতন, অত্যাচার ও বর্বরতা সম্পর্কে ১৯৩১ সালে **Pope Pious Encyclical Quadraesimo Anno** -উল্লেখ করেন ঃ সমাজতন্ত্র দুইটি জিনিস প্রচার করে ও পেতে চায়- তা হলো নিরবচ্ছিন্ন শ্রেনী সংগ্রাম এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ন বিলোপ সাধন। এ ব্যাপারে তাদের কোন গোপনীয়তা নাই বা কোন গোপন পদ্ধতির কথা বলাও হয় না বরং তা করা হয় জনসমক্ষে,

, খোলাখোলিভাবে এবং সম্ভাব্য যে কোন পন্থায় তা সে যত জঘন্য বা বর্বরোচিত হোক না কেন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোন ভয়-ভীতি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা পছন্দ অপছন্দের কোন স্থান নাই। ক্ষমতায় আরোহনের পর এ মতাদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যে কোন নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাখেনা। অর্থাৎ নিষ্ঠুরভাবে তা বাস্তবায়ন করে। পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ায় যে ভয়াবহ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ এদের দ্বারা সাধিত হয়েছে তা এরই প্রমান বহন করে। উল্লিখিত বর্ননায় দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্র প্রধান দুটি নীতি বাস্তবায়ন করতে চায়-নিষ্ঠুর শ্রেনী সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ন বিলোপ সাধন। অন্য কথায় বিবর্তনবাদের বাস্তবায়ন অর্থাৎ ডারউইন যে পদ্ধতি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন সেই একই মতবাদ মানব সমাজে প্রয়োগ করা। অর্থাৎ জংলী প্রানীরা অস্তিত্বের জন্য যে যুদ্ধ করে এবং টিকে থাকে। মানুষ্য সমাজের লোকেরা একইভাবে পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে তাই কারো কোন নিজস্ব সম্পত্তি থাকারও প্রয়োজন নাই। কারন ‘‘জোর যার মুল্লুক তার’’। এখানে ব্যক্তিগত সম্পদ থাকার অবকাশ বা সুযোগ কার বা কোথায়। সমাজতন্ত্র যে বিপর্যয়ের কারন ঘটিয়েছে তা রাশিয়ায় শেষ হয়ে যায়নি। যে সমস্ত দেশ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চীন তার মধ্যে অন্যতম।

ডারউইনবাদী মাওসেতুং ও তার ধ্বংসযজ্ঞ

চীনা কমিউনিষ্ট নেতা মাওসেতুং এর দুই প্রধান গুরু ছিলেন চার্লস ডারউইন ও জোসেফ ষ্ট্যালিন। দুটি ভয়াবহ নাম যা মাও এর ব্যক্তিত্বে মিশে গিয়েছিল, যা চীনা ইতিহাসে এক গভীর দুঃখজনক ও কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রায় ৬-১০ মিলিয়ন লোককে মাওসেতুং এর সরাসরি নির্দেশে হত্যা করা হয়। কোটি কোটি লোককে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটাতে হয়েছে। এখানে প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক মারা যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে ২০ থেকে ৪০ মিলিয়ন লোক অনাহারে মৃত্যুবরন করে। **The Great Leap Forward** নামক চরম গোঁড়া নীতির কারনে ১৯৮৯ সালের জুনে **Tienanmen Square** গণহত্যায় প্রায় ১০০০ হাজার লোক মারা যায়। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনাই চীনা নীতি বহিঃ প্রকাশের একটি অংশ।

পূর্ব তুর্কীস্তানে মুসলিমদের হত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এখনও চলছে। চীনা বিপ্লবের সময় ভয়াবহ বর্বরোচিত ও অমানবিক ঘটনা ঘটতে থাকে। চীনা জনগন তখন এক ধরনের গণসম্মোহনের শিকার হয়। সকল প্রকার জঘন্য কর্মকান্ড ও হত্যা অবলোকন করে তারা চিৎকার করে এর সমর্থন দেয়। **Le Livre Noir Du Communism (Black Book of Communism)** নামক পুস্তকটি যা একদল শিক্ষক ও ঐতিহাসিক কর্তৃক লিখিত। সমাজবাদীদের নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত কর্মকান্ড সম্পর্কে লিখেছেন,

সমস্ত জনগনকে প্রতি বিপ্লবীদের গন বিচার দেখার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়। এদের শাস্তি মৃতুদন্ড। প্রত্যেকেই এ হত্যাকান্ডে সামিল হয় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে - ‘‘হত্যা কর, হত্যা কর।’’ পরবর্তীতে মৃতদেহকে **Red Guard** এর নিকট হস্তান্তর করা। তাদের দায়িত্ব হলো তা খন্ড বিখন্ড করা। কখনও কখনও খন্ড দেহ রান্না করে খাওয়া হতো। অথবা মৃতের পরিবারের সদস্যদের জোর করে তা আহার করানো হতো সবাইকে এক ভোজে দাওয়াত দেওয়া হতো যেখানে ভূতপূর্ব ভূস্বামীর হৃদপিন্ড ও কলিজা ভাগ করে দেওয়া হতো। সদ্য কর্তিত মস্তকগুলো সারিবদ্ধভাবে লোহার

দন্ডে বিদ্ধ করে সভায় বক্তৃতার মঞ্চে রাখা হতো। এ ধরনের প্রতিহিংসা পরায়ন নরমাংস ভক্ষনের মোহ পরবর্তীতে কম্বোডিয়ার পলপট প্রশাসনে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। প্রাচীন পূর্ব এশিয়ার অপসংস্কৃতি একটি দিক (নর মাংশ ভক্ষণ) যা চীনা ঐতিহাসিক মহা বিপর্যয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

কমিউনিষ্ট বর্বরতার তিক্ত মাসুল

কমিউনিষ্টরা যেখানেই ক্ষমতা আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে সে সব দেশেই এ ধরনের নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কম্বোডিয়া, উত্তর কোরিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, পূর্ব ইউরোপীয় ও আফ্রিকার দেশ সমূহের জনগন অনুরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষ করেছে বা শিকার হয়েছে। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলীর তথা কমিউনিষ্টদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মাশুলের বিস্তারিত বিবরন **The Black Book of Communisim** নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ দেশ, সরকার বা শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধগুলোর প্যাটার্ন সম্পর্কে অপরাধগুলির একটি সনাক্তকরন বা চিহ্নিতকরনের মত একটি ছাঁচ বা নমূনা দেখতে পাওয়া যায়। এ সব নমুনার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে-গুলি করে হত্যা, পুনঃ পুনঃ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা, পানিতে ডুবিয়ে হত্যা, পিটিয়ে হত্যা, কোন কোন ক্ষেত্রে গ্যাস বা বিষ প্রয়োগে হত্যা, অথবা গাড়ী দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটানো, ব্যাপক সংখ্যক জনগনকে না খাইয়ে মেরে ফেলা, মানব সৃষ্ট দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে মৃত্যুর পরিবেশ সৃষ্টি বা ক্ষুধায় মৃত্যু, খাদ্য না দিয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া অথবা দুইই। দেশান্তরিতকরন, এ প্রক্রিয়ায় যাতায়াতের কষ্টে বহু সংখ্যক লোক মারা যায় অথবা বদ্ধ যায়গায় বন্দী হয়ে থাকার কষ্টে লোক মারা যায়, বাধ্যতামূলক শ্রম তথা সীমাহীন ক্লান্তি, অসুস্হতা, ক্ষুধা ও ঠান্ডায় মৃত্যু। কখনও কখনও একে গৃহযুদ্ধ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তবে বিষয়টি আরো জটিল। শাসক শ্রেনীর সাথে বিদ্রোহীদের সাথে দ্বন্দ্ব সংগ্রামে মৃত্যু ও সাধারন জনগনকে ব্যাপক হারে হত্যা করার বিষয়টি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা খুবই কষ্টসাধ্য। যাহোক, আমাদের কোথাও না কোথায় থেকে শুরু তো করতে হবে। এ সব অপরাধমুলক কার্যক্রমের একটি (বেসরকারী) হিসাবের তালিকা থেকে অপরাধ সমূহের ভয়াবহতা কিছু বুঝতে পারা যাবে ঃ

ক্রঃ নং	দেশের নাম	মৃত্যুর সংখ্যা/পরিমান
ক।	সোভিয়েত ইউনিয়ন	২০ মিলিয়ন মৃত্যু
খ।	চীন	৬৫ মিলিয়ন মৃত্যু
গ।	ভিয়েতনাম	১মিলিয়ন মৃত্যু
ঘ।	উত্তর কোরিয়া	২মিলিয়ন মৃত্যু
ঙ।	পূর্ব ইউরোপ	১মিলিয়ন মৃত্যু
চ।	কম্বোডিয়া	২মিলিয়ন মৃত্যু
ছ।	ল্যাটিন আমেরিকা	১,৫০,০০০ মৃত্যু
জ।	আফ্রিকা	১.৭ মিলিয়ন মৃত্যু
ঝ।	আফগানিস্হান	১.৫ মিলিয়ন মৃত্যু
ঞ।	আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এবং কমিউনিষ্টি পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকাকালীন পরিস্থিতিতে	১০,০০০

সর্বসাকুল্যে ১০০ মিলিয়ন লোক মৃত্যুবরন করে।

কমিউনিষ্ট সরকার ও সংগঠন সমূহ একই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল ঃ সকল মানবীয় অনুভূতি যথা দয়া, মায়া, ন্যায় বিচার বিবেককে কোনক্রমেই কোন প্রকার গুরুত্ব দেওয়া হবে না বা যাবে না। হঠাৎ করে মানব সমাজ একটি যুদ্ধক্ষেত্র ও গণহত্যার মাধ্যম হিসাবে পরিগনিত হতে শুরু করলো। যেমন নাকি বনে হিংস্র প্রানীরা খাদ্য ও ভুমির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়, সে রকমভাবেই মানুষ মানুষের সাথে একই কারনে যুদ্ধে অবতীর্ন হতে শুরু করলো। তাই তারা ‘‘ পশুর ’’ ন্যায় আচরন করতে শুরু করে। কারন ডারউইন তাদেরকে শিখিয়েছেন যে, মূলতঃ মানুষ এক ধরনের পশু। পশু যেমন টিকে থাকার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তাই তাদেরকেও অনুরূপ ব্যবহার বা আচরন করা উচিত বা করতে হবে।

এই অমানবিক আন্দোলন সমূহের নেতারা মনে করতে থাকেন যে, এক ধরনের মিথ্যা বৈজ্ঞানিক যুক্তির মুখোশ গ্রহনের মাধ্যমে তারা জনগনের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বলশেভিক নেতৃবৃন্দ জোর গলায় তাদের আক্রমন, সন্ত্রাস ও গণহত্যা সম্পর্কে কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন শুধুমাত্র এ কারনে যে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এ ধরনের কর্মকান্ডকে সমর্থন প্রদান করে। **P. J.** এর **Darlington** তার **Evolution for Naturalists** নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, বর্বরতা বিবর্তনবাদের একটি অপরিহার্য স্বাভাবিক প্রবনতা ও ফসল। তাই এ ধরনের আচরন খুবই যুক্তি সংগত। সর্বপ্রথমে যা প্রণিধানযোগ্য তা হলো স্বার্থপরতা ও সংঘাত মানব চরিত্রে জন্মগতভাবে তার পশুপূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছে। তাই দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সংগ্রাম মানুষের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক যা বিবর্তনেরই সৃষ্টি।’’

বিবর্তনবাদীদের এ ধরনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ হলো কমিউনিষ্ট মতাদর্শের পথ নির্দেশক। এ কারনেই তারা, মানুষকে পশু হিসাবে মনে করে এবং পশুর সাথে যেমন আচরন করা উচিত তাই করে থাকে। কারন যারা কমিউনিজম-ডারউইনবাদকে তাদের মতাদর্শ হিসাবে গ্রহন করে, তারা সৃষ্টিকর্তা এ পৃথিবীতে তার আসার কারন ও পরকালে তার কর্মকান্ডের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার বিষয়টি বিস্মৃত হয় বা বিবেচনাই করে না। ফলে আল্লাহতে অবিশ্বাসী সকল লোকের মত, সে একজন অত্যন্ত স্বার্থপর, নিষ্ঠুর-নির্দয়, স্বৈরতন্ত্রী এমনকি হিংস্র, খুনি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। আল্লাহতালা পবিত্র কোরানে এ ধরনের লোকের পরিনতি সম্পর্কে এ ভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

‘‘কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরন করিয়া বেড়ায় উহাদের জন্য রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি। ’’(সুরা-সূরা-৪২)।

উপসংহার

ধর্মের অনুপস্থিতির কারনে এটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি প্রকাশ্য সন্ত্রাস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কমিউনিষ্ট, নাজীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের মানব জাতির উপর এ ধরনের গণহত্যা, খুন, নিদারুন দুঃখ দুর্দশার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে অনেকে ভাবতেন যে, এ মতাদর্শ সমূহের অনুসারীরা কিভাবে সাধারন মানবীয় অনুভূতি থেকে বিচ্যুত হয়ে এ ধরনের জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের বর্বরোচিত ও নিপীড়নমূলক ঘটনা সংঘটনের একমাত্র কারন হলো - এ সমস্ত মতাদর্শের নেতৃবৃন্দ কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাদের খোদার কাছে জবাবদিহিতা বা খোদাভীতির কোন ধারনাও ছিলনা। কোন ব্যক্তি যদি খোদাভীরু হয়, তা হলে সে কোন ক্রমেই পুর্বোল্লেখিত কোন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার বা খুন করতে সক্ষম হবে না। উপরন্তু যিনি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক খোদাদ্রোহী মতাদর্শে বিশ্বাসীও হতে পারেন না।

পক্ষান্তরে যে লোক, কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় বা যার অন্তরে খোদাভীতি থাকে না, তার কাজের কোন সীমারেখা থাকে না। সে বিশ্বাস করে যে, সে এবং তার পূর্ব পুরুষ পশু ছিল এবং বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় মানবে রূপান্তরিত হয়েছে। সে এও বিশ্বাস করে, জড় পদার্থ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নাই, সব কিছুই জড় পদার্থ থেকে দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের লোকই সুযোগ পেলে এ ধরনের নিষ্ঠুর আচরন করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে যদিও মনে হতে পারে যে, তারা কারো কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ পেলে দেখা যাবে যে, সে একজন জঘন্য খুনী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, মানুষকে নির্যাতন, না খাইয়ে হত্যা ইত্যাদি কার্যক্রম করতে দ্বিধা করে না, শুধু এ কারনেই যে তার প্রতিপক্ষ এ মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়।

১৯৭০ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী রাশিয়ান লেখক **Alexander I Solzhenitsyn** ১৯৮৩ সালে লন্ডনে এক বক্তৃতায় রাশিয়ার জনগনের দুঃখ দুর্দশার কারন বর্ননা প্রসংগে বলেন,

‘‘আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যখন আমি শিশু ছিলাম, তখন বেশ কিছু বৃদ্ধ লোক রাশিয়ার জনগনের দূর্ভোগের কারন ব্যাখ্যা প্রসংগে বলতে শুনেছেন, মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেছে সে কারনেই এ সব কিছু হয়েছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ৫০ বৎসর ধরে আমি আমাদের বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে গবেষনা করেছি। এ প্রক্রিয়ায় শত শত বই পাঠ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে শত শত প্রমান ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছি। এ বিদ্রোহের আবর্জনা পরিষ্কার করার লক্ষ্যে নিজেও ৮ ভলিউম পুস্তক লিখেছি। কিন্তু আজও আমাকে যদি কেহআমাদের মহা ধ্বংসযজ্ঞ যাতে ৬০ লক্ষ লোককে বলি হতে হয়েছে তার প্রধান কারন সংক্ষিপ্ততমভাবে বলতে বলা হয়, তাহলে আমি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া সঠিকভাবে অন্য কিছুই বলতে পারবোনা, আর তা হলো-মানুষ ঈশ্বরকে ভূলে গেছে, তাই এ সব ঘটনার অবতারনা হয়েছে।’’

Solzhenitsyn এর পর্যবেক্ষন সঠিক। প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতির অনুপস্থিতি বা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারনেই সমাজে এ ধরনের সন্ত্রাস; সংঘাত ও অত্যাচার ঘটতে পারে এবং সবাই এ ব্যাপারে সাক্ষীগোপালের ভূমিকায় অবতীর্ন হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহতালা কখনও কোন কিছু ভুলেন না কোন ভুল

করেন না। হৃদয়হীন কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ তারা নিজেদেরকে প্রচন্ড ক্ষমতাধর বিবেচনা করে সমাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করতো। নিজেদের মধ্যে গোপন সভায় জনগনের জন্য নিত্য নতুন নির্যাতনের ফন্দি ফিকির করতো। তারা যখন এগুলো করতো আল্লাহতালা এর সব কিছুই জানতেন। তারা যা করেছে তার শাস্তি আল্লাহতালা অবশ্যই দিবেন। পবিত্র কোরানে তিনি ঘোষনা করেছেন, ''সেই দিন, যেদিন উহাদের সকলকে একত্রে উত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত, আল্লাহ তাহার হিসাব রাখিয়াছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। তূমি কি লক্ষ্য কর না, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন, তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাহাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত না থাকেন এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না, যাহাতে তিনি ষষ্ঠ জন হিসাবে উপস্থিত না থাকেন। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হোক তিনি তো তাহাদের সকলের সংগেই আছেন উহারা যেখানেই থাকুন না কেন। অতঃপর উহারা যাহা করে তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত (সুরা মুজাদালা-৬-৭)।''

এদের মধ্যে কোন কোন মহল বা গোষ্ঠি সব নিষ্ঠুর নেতাদেরকে অনুসরন করতো। তাদের পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে চলতো। তাদের পরিনতি সম্পর্কে পবিত্র কোরানে ঘোষনা করা হয়েছে যে, ''নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।(সুরা-ইউনুস-৪৪)। অর্থাৎ এরা নিজেরাই আল্লাহর ধর্ম ভুলে গিয়ে নিজেদের উপর জুলুম করেছে।

''এ পৃথিবীতে যারা অন্যায় অপকর্ম করে তাদের এই পৃথিবীতে কি অবস্হা হয় এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে ঃ মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্হলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে, যাহার ফলে আল্লাহ উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে(সুরা রাদ-৪১)।

মানব জাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক বিপর্যয় শুধুমাত্র আল্লাহ পরকাল ও তাঁর কাছে জবাবদিহি করার উপর গভীর বিশ্বাস করে সৎ কর্ম করে যাওয়া। অর্থাৎ আল্লার দেওয়া কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী উন্নত নৈতিক চরিত্র অর্থাৎ মানুষের প্রতি ভালবাসা দয়া, বিশ্বাস প্রভৃতি সদগুন বিকশিত করার মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করা। এই বিষয়টি পবিত্র কোরানে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

''মুমিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎ কর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব ''(সুরা-নাহল-৯৭)।

পুঁজিবাদ ঃ অর্থনীতিতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম

পুঁজিবাদ অর্থ হচ্ছে পূঁজির সার্বভৌমত্ব, যা একটি উন্মুক্ত ও অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্হা যার ভিত্তি শুধূমাত্র লাভ বা মুনাফা। এই অর্থ ব্যবস্হায় সমাজ প্রতিযোগীতাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়ে থাকে। পুঁজিবাদে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ন উপাদান রয়েছে-ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, প্রতিযোগীতা ও মুনাফা বা লাভ পুঁজিবাদে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারন এ অর্থ ব্যবস্হায় ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। বরং তাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে একাকী স্বীয় প্রচেষ্টায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে

হয়। পুঁজিবাদী সমাজ এমন একটি রঙ্গমঞ্চ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিকে অন্যের সাথে কঠোর ও নিষ্ঠুর প্রতিযোগীতামূলক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। এটা এমন একটি স্থান যেমন নাকি ডারউইন বর্ননা করেছেন,

যেখানে বলশালী সমাজে টিকে থাকবে দূর্বল ও ক্ষমতাহীন ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবুও যেখানে নিষ্ঠুর প্রতিযোগীতা প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে।

পুঁজিবাদী মতবাদের যুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তি - যা একজন লোক, কোম্পানী অথবা জাতি যাই হোক না কেন শুধুমাত্র নিজের সুবিধা ও উন্নতির জন্য জীবন সংগ্রামে অবতীর্ন হবে। এই যুদ্ধে সবচেয়ে বড় উপাদান হলো উৎপাদন। সবচেয়ে ভাল উৎপাদনকারী টিকে থাকবে দূর্বল ও অযোগ্যরা ধ্বংস হয়ে সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যাবে। পুঁজিবাদের বাস্তব অবয়ব বা কাঠামো এ রকম। এ অর্থ ব্যবস্থায় যারা এ কঠোর জীবন সংগ্রামে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে দরিদ্রের কাতারে তাদের স্থান করে নিচ্ছে তারাও যে মানুষ সে কথা বিবেচনায়ই আনা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো- সার্বিকভাবে মানুষের বরং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এ উন্নয়নের ফলে প্রাপ্ত মালামাল বা সেবার মান। এ কারনেই একজন পুঁজিপতি যাকে তিনি অর্থনৈতিক সংগ্রামে পদদলিত করে সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করে প্রতিষ্ঠালাভ করলেন তিনি কখনও সেই হত দরিদ্র ব্যক্তির জন্য কোন নৈতিকতা বা সহানুভূতি বা বিবেকের দংশন অনুভব করেন না, এবং তাকেও (জীবন সংগ্রামে পরাজিত ব্যক্তি) যে এক গভীর সংকটে কাল কাটাতে বাধ্য হতে হয়, তা বিবেচনায়ই আনা হয় না । এটাই সমাজে অর্থনৈতিক ডারউইনবাদের বাস্তব প্রয়োগ।

সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতামূলক উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। তাই এ মতবাদের প্রস্তাবনা। এই অর্থ ব্যবস্থাপনায় দূর্বল ও পরাজিত ব্যক্তিকে কোন রকম সাহায্য সহযোগীতা প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। সামাজিক ডারউইনবাদের তাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদের সাফল্যের জন্য এ ধরনের জীবনাদর্শেরই নৈতিক তথা ''তাত্ত্বিক সমর্থন ও তথাকথিত ''বৈজ্ঞানিক যুক্তি '' প্রদান করেছেন। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, পুজিবাদী ডারউইনবাদের প্রধান সমর্থকদের একজন **Tille** উল্লেখ করেছেন,

''সমাজে বিদ্রোহকে প্রতিহত করার জন্য অর্থনৈতিক জীবন সংগ্রামে পরাজিত শ্রেনীকে সাহায্য করা হবে একটি মস্তবড় ভুল। কারন এর অর্থ হলো ''প্রাকৃতিক নির্বাচন'' প্রক্রিয়ায় বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা আর এটাই হলো সামাজিক বিবর্তনবাদের ভিত্তি।''

সামাজিক ডারউইনবাদের অন্যতম প্রবক্তা **Herbert Spencer** যিনি জনজীবনে সামাজিক ডারউইনবাদের নীতি প্রয়োগের প্রথা চালু করেন। তিনি বলেন, যদি কেহ গরীব হয়ে থাকে এটা তারই দোষ। তাই তাকে ধনী করার ব্যাপারে অবশ্যই কেহ কোন রকম সাহায্য সহযোগীতা করবে না। যত অনৈতিক পদ্ধতিতেই হোক না কেন এটাই (ধনী হওয়াটাই) তার যোগ্যতা। এ কারনেই ধনী ব্যক্তি টিকে থাকবে। পক্ষান্তরে গরীব মানুষ সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান ডারউইনবাদী-পুঁজিবাদী নৈতিকতার এটাই সারাংশ। ১৮৫০ সালে **Spencer** তার এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করে **Social Statistics** নামক পুস্তক প্রনয়ন করেছেন। তিনি সকল প্রকার সমাজ কল্যানমূলক কাজে রাষ্ট্রীয় সহায়তার বিরোধিতা করেন। এমনকি স্বাস্থ্য সেবা, স্কুলে সরকারী সহায়তা, বাধ্যতামুলক টিকা

প্রদান কার্যক্রম পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাবিত কর্মসূচীতে যে কোন কল্যানমূলক কাজে সরকারী সহায়তা না দেওয়া অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কারন সামাজিক ডারউইনবাদের মতে সামাজিক শ্রেনীবিন্যাস শক্তিধরদের টিকে থাকার নীতির ভিত্তিতে প্রনীত। দূর্বল ও গরীদের সমর্থন ও কোন রকম সহায়তা এই নীতির পরিপন্থি। ধনীরা এ কারনেই ধনী যে, তারা অধিকতরযোগ্য বা উপযুক্ত। কোন কোন জাতি অন্যদের শাসন ও শোষন করে কারন তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোন কোন জাতি/প্রজাতি কারো অধীন হয়ে যায় কারন তারা অধীনস্থদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান তথা যোগ্য। **Spencer** এ মতবাদ সমাজে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তারা যদি স্বয়ংসম্পূর্নভাবে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলেই তারা বাঁচবে এবং তাদের বেঁচে থাকা উচিত। পক্ষান্তরে তারা যদি সম্পূর্নরূপে বেঁচে থাকতে না পারে, তারা মারা যাবে এবং তাদের মৃত্যু ঘটাই সমাজের জন্য মঙ্গলজনক।

আমেরিকার **Yale University** এর রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক **Graham Sumner** যিনি আমেরিকায় সামাজিক ডারউনবাদের মূখপাত্র। তার একটি প্রবন্ধে তারা চিন্তাধারা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করেন, ‘‘ আমরা যদি কোন লোককে সমাজে উপরে উঠতে সাহায্য করি, তার অর্থ হলো তাকে ধাককা দেওয়া। অর্থাৎ এটা একটি প্রতিক্রিয়া। সমাজে এ প্রক্রিয়া গ্রহন করার অর্থ হলো- কাউকে উপরে উঠানো হলে অন্য একজনকে ধাককা দিয়ে নীচে নামানো।’’

New York এর **American Museum** এর **Natural History Magazine** এর সিনিয়র সম্পাদক **Richard Milner** লিখেছেন যে, ‘‘ সামাজিক ডারউইনবাদের একজন মূখ্য প্রবক্তা, **Princeton** এর **William Graham Sumner** এর মতে, সমাজের কোটিপতিরাই হচ্ছে সবচেয়ে যোগ্যব্যক্তি এবং সকল প্রকার সুবিধা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত। তারা কঠোর প্রতিযোগীতামূলক পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক ডারউইনবাদীরা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ‘‘ বৈজ্ঞানিক ’’ ব্যাখ্যা প্রদান করে এটিকে সমর্থন দিয়ে থাকেন। ফলে মানুষের মনে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাহায্য, সহযোগীতা, মানবতাবাদ ইত্যাদি চিন্তা -চেতনা সম্পূর্নরূপে অপসৃত হয় এবং এর বদলে স্বার্থপরতা, চতুরতা, সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কর্মকান্ড সমাজে প্রশংসনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

সামাজিক ডারউইনবাদের একজন গুরুত্বপূর্ন তাত্ত্বিক আমেরিকার অধ্যাপক **E.A Ross** বলেন, ‘‘ খৃষ্টান ধর্মীয় মূল্যবোধ দান দক্ষিনা যার অর্থ হলো দয়া, মানবতা, সেবা, মমতা ইত্যাদি - যা মূর্খ ও অপরিনত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দাসবৎ বেঁচে থাকার আশ্রয় স্থল। **Ross** এর মতে ‘‘ এ প্রক্রিয়ায় দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র তার আশ্রয়ে বধির ও বোবা-কালাকে নিয়ে আসে অর্থাৎ এটি একটি বোবা কালা প্রজাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া মাত্র।’’ এ সব কিছু প্রত্যাখান করে তিনি বলেন, এ সকল কর্মকান্ড বিবর্তনবাদের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এ প্রসংগে **Ross** তার চূড়ান্ত রায় ঘোষনা করে বলেন ‘‘ এ বিশ্বকে বেহেস্ত বানানোর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ হলো, ‘‘যারা এ ব্যাপারে বেশী আগ্রহী, তারা যেন

নিজ উদ্যোগে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়।'' অর্থাৎ সকল অমানবিক কাজে লোক অধিক আগ্রহী হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, ডারউইনবাদ পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত। আবার রাজনৈতিক পদ্ধতিতেও এই মতাবাদ থেকে তার আকার আকৃতি তথা কাঠামো গ্রহন করে থাকে।

এ কারনেই দেখা যায় যে, পুঁজিপতিরাই হচ্ছে সামাজিক ডারউইনবাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক। শক্তিবাদীদের উত্থান গরীবদের পদদলিত করা এবং এমন একটি অর্থনৈতিক দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা যেখানে দয়া, সাহায্য, সহযোগীতা মানবতাবাদের কোন স্থান বা উপস্থিতি নাই এবং এই ধরনের দার্শনিক চিন্তা বা মতাদর্শকে নিন্দা বা অসমর্থনযোগ্য বিবেচনা না করে বরং এটিকে ''বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা'' বা ''প্রাকৃতিক আইন'' হিসাবে সানন্দে গ্রহন করা হয়।

Social Darwinism in American Thought পুস্তকের **Richard Hofstadter** উল্লেখ করেছেন যে, উনবিংশ শতকের **Rail Magnaete** (রেলপথ নির্মাতা ব্যবসায়ী) **Chauncery Depew** জোর দিয়ে বলেন, নিউইয়র্ক শহরে যারা যশ, সৌভাগ্য ও ক্ষমতা অর্জন করেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে '' যোগ্যতমদের টিকে থাকা '' তত্ত্বের আদর্শ প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্ব। কারন এরা শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা, দুরদর্শিতা, খাপ খাওয়ানোর অসাধারন যোগ্যতাবলে এ সাফল্য অর্জন করেছেন। অন্য একজন **Railway Baron, James J. Hill** দাবী করেন, রেল কোম্পানীগুলোর সৌভাগ্য ও সফলতা ''যোগ্যতমদের টিকে থাকার আইনের'' মাধ্যমেই নির্ধারিত। আমেরিকার প্রখ্যাত পুঁজিপতি **Andrew Carneige** তার বিবর্তনবাদের উপর বিশ্বাস, এ ভাষায় ব্যক্ত করেন, ''আমি বিবর্তনবাদের সত্যতা খুঁজে পয়েছি।'' অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ এই প্রতিযোগীতামূলক আইন এখানে আছে। আমরা এটা পাশ কাটিয়ে যেতে পারব না, আর এর কোন বিকল্পও নাই। যদিও আইন কখনও কখনও ব্যক্তি বিশেষের জন্য কঠোর হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে মানব জাতির জন্য এটা এক সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি) কারন এর মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগে যোগ্যতমদের টিকে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।''

আমেরিকার সবচেয়ে বড় পুঁজিপতিদের ডারউইনবাদের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক **Kennett J. HSU** তার নিবন্ধ **Darwin's Three Mistakes** এ উল্লেখ করেছেন, ডারউইনবাদকে ব্যক্তি প্রতিযোগীতার স্বপক্ষে ব্যবহার করা হয় এবং এর স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তা মুক্ত বাজার অর্থনীতি তথা পুঁজিবাদেও এই নীতি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় চালু করা হয়। **Andrew Carneige** লিখেছেন যে, ''প্রতিযোগীতামুলক আইন পছন্দ অপছন্দ যাই হোক না কেন এটার অস্তিত্ব আছে এবং তা আমরা বাদ দিতে পারিনা।''

বিশ্ববিখ্যাত ধনী পুঁজিপতি **Rockefeller** এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে দাবী করেন ঃ ''বৃহৎ ব্যবসার বিকাশ হলো যোগ্যতমদের টিকে থাকার বাস্তব প্রতিফলন। এটা প্রাকৃতিক আইনের সামাজিক বাস্তবায়ন।''

এটা সত্যিই খুব কৌতুহলজনক যে, আমেরিকার পুঁজিপতিদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাতা যেমন রকফেলার ফাউন্ডেশন, কারনেগী ইনষ্টিটিউটশন প্রভৃতি বিবর্তনবাদের গবেষনা কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, পুঁজিবাদ জনসাধারনকে শুধুমাত্র টাকা ও এথেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাকে পূজা করতে বাধ্য করে বা টেনে আনে। পৃথিবীর সকল ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্বহীন বা বাজে হিসাবে বিবেচনা করে। যে সকল সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তনবাদী মতাদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তারা শুধু বস্তুবাদী শক্তিরই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দয়া, মায়া, আত্মত্যাগ প্রভূতি মানবীয় গুনাবলীর দিকে তা কোন রকম দূরতম সম্পর্কও রাখে না।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজ ব্যবস্থায়ই পুঁজিবাদী নৈতিকতার প্রভাবাধীন। এ কারনে গরীব, অসহায় ও পংগুদের কোন প্রকার দয়া দাক্ষিণা বা সাহায্য সহযোগীতা দেওয়া হয় না। এমন কি যদি তারা কোন কারনে রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে এমন মানুষই দেখতে পাওয়া যায় না এবং এভাবেই সে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। কোন কোন দেশে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে নিষ্ঠুর ও অমানবিক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ইথিওপিয়ার এর জনগনের অনাহারে মৃত্যুর কারন এই পুঁজিবাদী নৈতিকতা। অর্থাৎ এরা পুঁজিবাদী নৈতিকতার শিকার। যদিও বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য-সহযোগীতা এই ক্ষুধার্ত মানুষ গুলোকে উদ্ধার করা যেত। কিন্তু তারা অনাহারে ও দারিদ্রের কুঠারাঘাতে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

পুঁজিবাদী সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটা সমাজে অসমতা বা অসাম্যের সৃষ্টি করে। এ ধরনের সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমাগত বাড়তে থাকে। গরীবরা যত গরীব হতে থাকে ধনীরা তত ধনী হতে থাকে। লক্ষ লক্ষ গৃহহীন লোকের অস্তিত্ব ও তাদেরকে অমানবিক পরিস্থিতিতে বসবাস করতে হচ্ছে তা পুঁজিবাদী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি আমেরিকার মত ধনী ও উন্নত দেশে পুঁজিবাদী মন-মানসিকতার কারনে এ ধরনের পরিস্থিতি বিদ্যমান। যদিও আমেরিকার সমাজ এত সম্পদশালী, যে ইচ্ছা করলে তারা এ সব দরিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠিকে রক্ষা করতে পারে, তাদের চাকুরী দিতে পারে। কিন্তু বর্তমান মন-মানসিকতা হলো গরীবদের সাহায্য নয় বরং তাদেরকে পদদলিত করে বড় তথা ধনী হওয়া। এ কারনে এ সমস্যার কোন সমাধান হয় না। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো সামাজিক বিবর্তনবাদের বাস্তব প্রয়োগের ফসল। এদের মতে বড় হতে হলে কাউকে না কাউকে পদদলিত করতেই হবে।''

এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আরর্ষন করা হচ্ছে, তা হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসে সব সময় গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখা গিয়েছে। এসব সমাজের স্বার্থ চিন্তা যা বস্তুবাদী চিন্তাধারাকেও গুরুত্বপূর্ন হিসাবে বিবেচনা করা হতো। সমাজে স্বার্থপরতা, শঠতা, ব্যক্তি স্বার্থই ধনী হওয়ার একমাত্র উপায় হিসাবে বিবেচিত হতো। অতীতেও সমাজে এ ধরনের লোকের অস্তিত্ব ছিল, যারা প্রচন্ড বস্তুবাদী ও নৈতিকতার বিচারে কোন আর্দশ স্থানীয় ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ ধরনের মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি এক নতুন মতাদর্শের সম্মুখীন হয়। বিগত ১৫০ বৎসর পর এধরনের নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধ ব্যক্তি সমাজে সমালোচিত ও নিন্দিত হওয়ার পরিবর্তে প্রশংসিত ও নন্দিত হতে শুরু করে। কারন সমাজে এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রাকৃতিক বিধান তথা স্বাভাবিক মানবীয় চরিত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ডারউইনবাদ সমাজে একটি মিথ্যা ধর্মমত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সকল প্রকার নীতিহীনতা ও হৃদয়হীন মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারাকে অন্যায় সমর্থন প্রদান করে

থাকে। এ বিষয়টি **Robert E D Clark** এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ''সংক্ষেপে বিবর্তনবাদ একজন অপরাধীকে তার বিবেকের বন্ধন থেকে অবকাশ দান করে, একজন প্রতিযোগীর প্রতি সবচেয়ে নীতিজ্ঞান শুন্য আচরনও অযৌক্তিক বিবেচনা করা হবে না, মন্দকে ভালো বলতে হবে।''

''**Evolution or Creation** নামক পুস্তকে **H Enoch** লিখেছেন, '' **Prof. J. Holmes** বলেন, ডারউইনবাদ সমাজে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে ভালকে টিকে থাকার মানদন্ডে বিচার করতে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে জঙ্গলের আইন যেখানে ''জোর যার মুল্লুক তার '' এবং যোগ্যতমই টিকে থাকে। চতুরতা বা নিষ্ঠুরতা বা কাপুরুষতা বা প্রতারনা যাই হোক না কেন, তাই ব্যক্তির সমাজে টিকে থাকার জন্য ভাল ও সঠিক।''

আমরা দেখেছি যে, ধর্মহীনতা ও ডারউইনবাদ বিগত ১৫০ বছরে সকল চিন্তাধারা মূল্যবোধ ও মতাদর্শকে পিছনে ফেলে বিশ্ব মানবতার জন্য দুঃখ, বেদনা, কষ্ট, দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা ও হতাশা বয়ে নিয়ে এসেছে। ধর্মহীনতা ও ডারউইনবাদকে যারা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষার হাতিয়ার মনে করেছে। তারা নিজেদের জন্য এই দর্শন অনুসরন করেছে তাহলো- দূর্বল নিশ্চিহ্ন হবে ও সবল টিকে থাকবে। তারা বুঝতে পারেনি যে, এ প্রক্রিয়ায় তারা সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি বিরাট ফাঁদ তৈরী করছে। প্রকতৃপক্ষে পরবর্তীতে তারা নিজেরাই এর শিকার হয়েছে। কারন তারা বেঁচে বা টিকে থাকার জন্য যত সংগ্রাম আর বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যত প্রচেষ্টাই চালাক না কেন, বাস্তবে বিশ্ব ব্রমান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এক জন প্রভূ, একজন বিচারক ও একজন মাত্র মালিক রয়েছেন। তিনি কোন ক্ষনস্হায়ী ক্ষমতাধর নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই এ মতাদর্শের অনুসরনে নিষ্ঠুর, নির্যাতন, দ্বন্দ্ব, সংগ্রামের মাঝে ক্ষমতা শক্তি ও সম্পদ অর্জন করে তা আল্লারই দান। যতই সে বিশ্বাস করুক না কেন, সে এমন একটি পরিস্থিতিতে/বা সমাজে বসবাস করছে সেখানে বল তথা ক্ষমতাশালীরা বিজয়ী হয় এবং দূর্বলরা সমাজ থেকে বিলীন বা নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, পৃথিবীতে মানবজাতি একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। এ বিষয়টি পবিত্র কোরানে এভাবে ঘোষনা করা হয়েছে, ''পৃথিবীর বুকে যাহা কিছু আছে আমি সেইগুলোকে উহার শোভা করিয়াছি, মানুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য উহাদের মধ্যে কে কর্মে 'শ্রেষ্ঠ' (সুরা কাহাফ-৭)।

যারা মনে করে তাদের বিত্ত-বৈভব, ক্ষমতা ও শক্তি তারা তথা কথিত অস্তিত্বের সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করেছে। তারা যে কি হৃদয় বিদারক বেদনা ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যে কোন ক্ষতি পূরনের কোন ব্যবস্হা নাই। পুনরুত্থান দিবসে যখন তারা প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তখন তারা বুঝতে পারবে কি ধরনের অন্তসারশুন্য, ফাঁপা ও মিথ্যা জীবন দর্শন তারা লালন করেছে। পবিত্র কোরানে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, '' জান্নাতবাসীগন, অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছিতোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তোমরা তাহা সত্য পাইয়াছেন কি? উহারা বলিবে হ্যাঁ। অতঃপর জনৈক ঘোষনাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষনা করিবে, আল্লাহর লানত জালিমদের উপর যাহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিতঃ উহারাই আখেরাত সমন্ধে অবিশ্বাসী । (সুরা আরাফ-৪০-৪৫)

আরাফবাসীগন, যে লোকদিগকে চিহ্ন দ্বারা চিনিবে এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসিল না। (সুরা আরাফ-৪৮)

ডারউইনবাদী পুঁজিবাদী ধ্যান ধারনা বা মতাদর্শের দ্বারা যারা প্রভাবিত হয় নি এবং যারা এ পৃথিবীতে তাদের আগমনের কারন ভূলে যায় নাই এবং এ সমন্ধে সচেতন এবং আল্লাহতালার অস্তিত্বে আস্থাশীল। তারা অন্যান্য মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি জীব হিসাবে বিবেচনা করে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যাদের সাথে মধুর, দয়া ও স্নেহশীল আচরন করে এবং তাদের দুঃখ কষ্ট অসুবিধা দূর করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করে। এরা তাদের সাথে মিষ্টি কথা বলে, এতিমদের দেখাশুনা করে, অসুস্থ ও পংগুদের দেখভাল করে। এ ধরনের লোক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং কোরানে বর্নিত আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তাদের কর্তব্যে অবিচল থাকে। এরাই সম্পদ, জাতি, বর্ণ, শ্রেনী, আদর্শ তথা দর্শনের কোন পরোয়া করে না। তারা এ সকল দূর্বলতা থেকে সর্ম্পূন মুক্ত। পবিত্র কোরান অনুযায়ী আল্লাহর দৃষ্টিতে এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

নৈতিকতা বিধ্বংসী ডারউইনবাদ

বিশ্বমানবতা তথা মানব জাতির জন্য ডারউইনবাদ সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি সাধন করেছে তা হলো জনগনের ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা। ধর্মীয় সকল প্রকার নীতি ও মূল্যবোধ অপসৃত হলো। ফলে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবক্ষয় সমাজকে গ্রাস করে ফেললো।

এ পর্যায়ে অনেকে বলতে পারেন যে, পৃথিবীতে বহু ধর্মহীন লোক বাস করে আসছেন যারা ডারউইন বা ডারউইনবাদ সম্পর্কে কোন ধারনাই রাখতেন না। তাই এ ব্যাপারে ডারউইনকে দোষারোপ করা সংগত নয়। বর্তমানে খুব কম সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তি ডারউইনবাদের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সীমিত ব্যক্তিবর্গই সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে থাকেন। সমাজের অগনিত লোক তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তারা তাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে সমাজে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক, সিনেমা পরিচালক, বিশ্ববিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, খবরে কাগজ তথা পত্রিকার সাথে জড়িত অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গই বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী এবং সংগত কারনেই নাস্তিক। এ কারনেই সমাজের যে ক্ষেত্রে এরা বিচরন করেন, সে সব ক্ষেত্রে তাদের বিবর্তনবাদী ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা প্রভাবিত করে থাকেন। ফলে এই বিকৃত মতাদর্শ সমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহনযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা পেয়ে থাকে।

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত ডারউহনবাদী জীব-বিজ্ঞানী **Ernst Mayr** সমাজে বিবর্তনবাদের অবস্থান বা ভুমিকা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

''ডারউইনের সময়কাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীকার করে আসছেন যে, মানুষ ও বানর একই বংশধারা থেকে উদ্ভুত। বিবর্তনবাদ মানুষের চিন্তাধারার সকল ক্ষেত্র অর্থাৎ দর্শন, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুকেই প্রভাবিত করেছে।''

ডারউইনবাদের মতাদর্শের আধিপত্য সমাজ জীবনে একটি অতি শক্তিশালী সম্মোহনী হিসাবে কাজ করেছে। যুব সম্প্রদায়ের এক বিশাল অংশ যাদের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম এবং বিশ্ব

দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারনা নাই। তারাই বিশেষ করে সহজেই ডারউইনবাদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। অতি সহজেই এ সকল লোককে একটি নির্ধারিত চিন্তাধারায় নিয়ে আসা যায়। কারন খবরের কাগজ, সাময়িকীতে তারা যা পাঠ করে, তারা যে সিনেমা বা নাটক দেখে, যে গান শুনে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হলো তারা বিদ্যালয়ে যে ধরনের শিক্ষা গ্রহন করে থাকে। এরই প্রভাবের ফলেই গত ১৫০ বছর যাবৎ ডারউইনবাদকে সত্য হিসাবে লোকে বিশ্বাস করে আসছে যদিও তা প্রতারনামূলক ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রমাণিত।

লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রকাশ্যে ধর্মবিরোধী প্রচারনা যদিও কদাচিৎ করা হয় এবং প্রকাশ্যে কেহই ধর্মহীনতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখে না। এই কারনে বিভিন্ন গোপন ও সুক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ধর্ম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা, ধর্মীয় বিষয় এবং ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রচারনা কার্যক্রমে এমন এমন শব্দ উচ্চারন করা হয়, যার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব, ভাগ্যকে অস্বীকার করা হয়। সঙ্গীত, উপন্যাস, সিনেমা, খবরের কাগজের শিরোনাম, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি ধর্মীয় অপপ্রচারের গোপন মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে ডারউইনবাদের বিষয়াদি ধর্মবিরোধী প্রচারনার সবচেয়ে সাধারণ হাতিয়ার। কোন রকম পারস্পরিক সম্পর্ক বা সূত্র ছাড়াই বানর, মানব জাতির পূর্ব পুরুষ ছিল এই সম্পূর্ন মিথ্যা কথাটি প্রচার করা হয়। মনোবিজ্ঞান গবেষনায়ও ডারউইনবাদকে সুক্ষ্মভাবে নিয়ে আসা হয়। ফলে এমন একটি সমাজ গঠিত হয়, যে সমাজের সদস্যরা ধর্ম, পুনরুত্থান বা পরকাল ও নৈতিক দায়-দায়িত্ব অতি তুচ্ছভাবে গ্রহন করে। এ সমাজ আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাও করে না, ভয়ও করে না, বিশ্বাসও করে না, ফলে তারা তাদের কর্মকান্ডে কোন ন্যায়নীতি, ধর্ম, আদর্শ কিছুই বিবেচনা করে না বরং তাদের ধারনা অনুযায়ী তাদের পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ পশুর ন্যায় আচরন করে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অমনযোগী ও খোদাভীরু নয় এমন মহিলার কাছে সত্বীত্ব বা সৎ চরিত্র বা চরিত্রবতী হওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। কারন তারা তাদের কাজের সীমারেখা সম্পর্কে অবহিত নয় বরং তারা যে কোন ধরনের নীতিহীনতা ও অসৎ কাজ করার জন্য আগ্রহী হবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে এই ধারনাই প্রচার করা হয়েছে যে, নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব বা ধর্মীয় অনুশাসন বা বিধি বিধানের কোন গুরুত্ব নাই। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের এই ধরনের বিচ্যুতি বা অবিশ্বাস ডারউইনাদের ব্যাপক প্রচারেই ফল। ফলে মানুষ মনে করে যে, তার কর্মকান্ডের কোন দায়-দায়িত্ব নাই এবং তার কারো কাছে জবাবদিহিও করতে হবে না। এই ধারনা তাকে দিনের পর দিন অধিক খারাপ কাজ করার দিকে ধাবিত করে।

গভীর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক হত্যা, পতিতাবৃত্তি, প্রতারনা, জুয়াচুরি, ঘুষ লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়ে, লোক ঠকানোসহ সকল অনৈতিক কার্যক্রমে ধর্মহীনতাই প্রধান কারন হিসাবে দৃশ্যমান হয়। ধর্মহীনতা প্রচারনার প্রধান বিষয় হচ্ছে ডারউইনবাদের মিথ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ মানুষ দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে তাই তার কোন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা নাই।

The Lie: Evolution এর লেখক **Ken Ham** ডারউইনবাদের ধর্মহীনতা সম্পর্কে লিখেছেন যে,

'' যদি আপনি আল্লাহকে অস্বীকার করেন এবং আল্লাহর জায়গায় অন্য কোন বিশ্বাস-যা হঠাৎ বা এলোপাথাড়ি কোন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস স্থাপন করেন, সে ক্ষেত্রে ন্যায় ও অন্যায়ের কোন ভিত্তি থাকে না।

আইন বলতে তাই বুঝায়, যা আপনি তৈরী করতে চান। এখানে কোন নীতি, সত্য বা অনুশাসনের বালাই নেই। জনগন নিজেরাই নিজেদের আইন প্রনয়ন করবে।''

বিখ্যাত ডারউইনবাদী **Theodious Dobzhansky** স্বীকার করেন যে, '' প্রাকৃতিক নির্বাচন যা ডারউইনবাদের ভিত্তি, এর মাধ্যমে একটি নৈতিকতাহীন ও অধপতিত সমাজ সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন অহমিকাবাদ, সাহসিকতার পরিবর্তে কাপুরুষতা, প্রতারনা ও শোষন প্রভৃতি কার্যক্রমকে লালন করে থাকে। সমাজের বিভিন্ন মহল মানুষের এইসব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট সমূহ বিকাশে বাধা দেয় এবং নিষেধ করে বরং, পক্ষান্তরে, এগুলোর পরিবর্তে দয়া, মহানুভবতা পরোপকারীতা, গোত্র, জাতির তথা মানবতার জন্য আত্মত্যাগের মত চারিত্রিক গুনাবলীকেই পৃথিবীর সকল সমাজ ব্যবস্থায়ই পরিপোষন করে থাকে।
আমরা আমাদের চারপাশে তাকালেই নৈতিকতার গভীর ও চূড়ান্ত অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখতে পাবো, যা ডারউইনবাদ বহুল প্রচেষ্টার মাধ্যমে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রগতি ও সভ্যতার উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগীতা একাগ্রতা, শ্রদ্ধা ও স্নেহশীলতাকে বাদ দেওয়ার ফলে যে প্রগতি ও সভ্যতার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে মর্মে ধারনা হয়ে থাকে এবং এ সম্পর্কে প্রায়ই বলা থাকে যে, বৃহত্তর উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা জরুরি। প্রকৃতপক্ষে, মানুষকে এ পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনার মাধ্যমেই এ ধরনের তথাকথিত উন্নয়ন সাধন কর্মকান্ডের মাধ্যমে করা সম্ভব হয়েছে। তাই এই ধরনের কর্মকান্ডকে উন্নয়ন বা সভ্যতা হিসাবে আখ্যায়িত করা সঠিক নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষ কোন পশু নয় এবং কোন পশু হতে সে আগমনও করেনি। আল্লাহতালা মানুষকে যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত গুনাবলীর কারনেই মানুষকে সম্পূর্ন আলাদা প্রজাতি বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু ডারউইনবাদী বস্তুবাদীদের প্রভাবে মানুষ তার নৈতিক চরিত্রের এ সমস্ত গুনাবলী ভুলে গেছে এবং অধঃ পতিত হয়ে সংকীর্নতা, চরিত্রহীনতা, বিবেকহীনতার এমন পর্যাযে পৌছেছে, এমনকি পশুদের মধ্যেও এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় না। তারা বলেন, ''যাই হোক না কেন আমরা পশুদের অধঃস্তন পুরুষ এবং এগুলো আমাদের বংশীয় উত্তরাধিকার এবং এ ব্যাপারে একটি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন, যা তাদের বিবেকহীনতা ও ইচ্ছা শক্তির অভাবের প্রতিফলন।

অনেক ডারউহনবাদী বৈজ্ঞানিক এই যুক্তি দিয়ে শুরু করেন যে, মানুষের মধ্যে যে অপরাধ প্রবনতা দেখা যায়, তা তাদের পশু পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী **Stephen Jay Gould** দাবী করেন, যদিও প্রথমে ইতালিয়ান পদার্থবিদ **Lombroso** তার বই **Ever Since Darwin** এ উল্লেখ করেন, অপরাধ প্রবনতার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কদাচিত নতুন। কিন্তু **Lombroso** বিবর্তনবাদের তত্ত্ব বিষয়ক এক বিকৃত যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ''জন্মগত অপরাধী হওয়ার কারন শুধুমাত্র বুদ্ধিভ্রংশতা বা অসুস্থতা নয়। এটা আক্ষরিক অর্থে পুর্বপুরুষের বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়। আমাদের আদিম বানর পূর্বপুরুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ আমাদের বংশধারায় পুনরাবৃত্তি ঘটায়। কিছু কিছু লোকের মধ্যে পূর্বপুরুষদের, অধিকাংশ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বিদ্যমান থাকে। এদের এ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অতীত অসভ্য সমাজের জন্য যথাযথ থাকলেও বর্তমান সমাজে এ সব বৈশিষ্ট্য গ্রহনযোগ্য নয় বিধায় আমরা তাদেরকে অপরাধী হিসাবে আখ্যায়িত করি। আমরা তাদেরকে করুনা করতে পারি, কারন তারা তাদেরকে (জন্মগতভাবে) সাহায্য করতে সক্ষম নয় ।''

ডারউইনবাদীদের দাবি অনুযায়ী, কোন মানুষ মানুষকে হত্যা করে, তাকে বেদনা দেয়, চুরি করে, মারপিট করে, এ সব কর্মকান্ড যারা ঘটায় তারা তাদের কথিত পূর্বপুরুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী। এ কারনে যারা এ সব অপরাধমূলক কাজ করে এতে তাদের কোন দোষ নাই এবং তারা ক্ষমার যোগ্য। '' এই বিকৃত চিন্তাধারার প্রভাবে সমাজে অপরাধের দন্ডের বিধান সিথিলভাবে কার্যকর করা হয় এবং সমাজে অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

এ সমস্ত বক্তব্য/মতামতের প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, ডারউইনবাদীরা মানুষের বিবেক, ইচ্ছাশক্তি, যুক্তি, বিচারবুদ্ধিবোধ ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয় এবং তারা মানুষকে বুদ্ধিহীন ও শুধুমাত্র পশু প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত প্রানী হিসাবে মনে করেন। এই চিন্তাধারানুযায়ী একটি হিংস্র সিংহ যেমন তার আক্রমনাত্মক মনোভাব বাদ দিয়ে নিরীহ আচরন যেমন -ধৈর্য, মার্জনা প্রভৃতি সদগুনাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয় না। একজন মানুষের মধ্যেও অনুরূপ মনমানসিকতা বা চিন্তাধারার বিদ্যমানতার অর্থ হচ্ছে, সমাজে অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংগ্রাম ও যুদ্ধ চলতেই থাকবে আর ডারউইনবাদ এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থাই প্রত্যাশা করে। এ ধারনা সমাজে বিদ্যমান থাকলে সমাজে এক ধরনের কান্ডজ্ঞানহীন জনগোষ্ঠি সৃষ্টি হয়, যারা নিজেদেরকে সম্পূর্নরূপে স্বাধীন ও বেপরোয়া বলে মনে করতে থাকে।

ডারউইনের প্রস্তাবিত দর্শন ঃ মানবতার জন্য নিষ্ঠুর ও হতাশাব্যঞ্জক

কোন ব্যক্তির জীবনের যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তা হলে তার চরিত্রোন্নয়নের কোন রকম প্রচেষ্টাই থাকে না। সে জীবনকে দায়-দায়িত্বহীন, তামাশার বস্তু মনে করে, অনুভূতিহীন ও সব কিছুই তার কাছে গুরুত্বহীন বলে মনে হয়, তার কার্যক্রমে বিবেকের কোন ভূমিকা থাকে না। সে নিজেকে যে কোন আইন কানুনের উর্ধে বলে মনে করে। তার কোন সদগুনাবলী ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে না বা তা অর্জনের কোন প্রচেষ্টাই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তার এ বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এেকটি উন্নত ধরনের পশু। অর্থাৎ সে শুধু অন্যান্য প্রানীর মতো সুখাদ্য ও প্রজনন ও সব ধরনের বিনোদন ও আনন্দ তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচনা করে এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। এভাবে ডারউইন বা ডারউইনবাদের কিছুই না জানা সত্ত্বেও একজন সাধারন মানুষ, ডারউইনের আর্দশের অনুসারী মানব সন্তান হিসাবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। এরা যেহেতু একটি নিষ্ঠুর জীবন যাপন করে থাকে। ফলে তারা নৈরাশ্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক হয়ে থাকে। মৃত্যুর মাধ্যমে সব কিছুরই সমাপ্তি ঘটবে এবং কিছুই তাদের অসুখী করে না। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের বন্দী হিসাবে দিন কাটায়। আত্মহত্যা, মানসিক সমস্যা, হতাশা, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি নেতিবাচক প্রভাব মানব সমাজে ডারউইনবাদের প্রত্যক্ষ ফল।

বিবর্তনবাদের একজন জোর সমর্থক **Richard Dawkens** এর মতে মানুষ একটি প্রজনন যন্ত্র মাত্র। মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষ নামক প্রানীর বীজ পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌছে দেওয়া **Dawkins** এর বিকৃত চিন্তধারায় এ ছাড়া মানব প্রজাতিতে এই পৃথিবী বেঁচে থাকার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। এ বিশ্ব ও মানব জাতি দৈবাৎ সংঘটিত এক বিশৃংখলার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। যারা এ ধরনের বিভ্রান্তিকর চিন্তা-চেতনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তারা সহজেই হতাশা ও নিরাশার শিকার হয়ে যান।

যে বিশ্বাস করে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শুধু প্রজনন ও সব কিছুই মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। তার কাছে -প্রেম, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সৌন্দর্য, সত্য, সততা সব কিছুই তুচ্ছ। জীবন নিষ্ঠুর ও অপ্রয়োজনীয় এবং সব কিছুই নিরানন্দ ও অর্থহীন।

Unweaving The Rainbow পুস্তকে মুখবন্ধে **Hawkins** মানব জীবনে ডারউইনবাদের নেতিবাচক ও হতাশাব্যঞ্জক প্রভাবের কথা স্বীকার করে লিখেছেন ঃ

আমার পুস্তকের একজন বিদেশী প্রকাশক তার বই পড়ে বলেছেন '' মানব জীবনের শীতল, অন্ধকার ও নিষ্ঠুর দিক যা এই বইতে লিখা হয়েছে তা তাকে এভাবে বিচলিত করেছে, যে তিনি রাত্রে ঘুমাতে সক্ষম হননি।'' অন্যরা তাকে (লেখককে) প্রশ্ন করেছেন, তিনি ঘুম থেকে কেমন করে জাগ্রত হতে পারেন। ভিন্ন দেশের একজন শিক্ষক তাকে নিন্দা করে লিখেছেন যে, একজন ছাত্রী তার বই পড়ে জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা অলীকত্ব ও ফাঁপা দিক সম্পর্কে পড়ে সে কাঁদতে থাকে। সেই শিক্ষক তার ছাত্রীকে বইটি অন্য কাউকে না দেখানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন, কারন এ ধরনের নৈরাজ্যবাদী ও হতাশাব্যঞ্জক ধ্যান ধারনায় যেন আর কেউ প্রভাবিত না হয়। সকল প্রকার বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশুনা মানব জীবন সম্পর্কে এমন এক ধরনের নিরানন্দ, নীরস, কাষ্ঠ সদৃশ দুঃখ, বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক ধারনা দেয় এবং সে মানব জীবন একটি অনুর্বর ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করে এবং জীবনের প্রতি অসম্ভব বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে যা এটা বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি অতি সাধারন অভিযোগ হিসাবে দেখা যায়। যদিও বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে খেলতে খুব আনন্দ পেয়ে থাকেন। আমার সহকর্মী **Peter Akins** এধরনের চিন্তাধারা থেকেই তার বই **The Second Law (1984)** লিখার কাজ শুরু করেন। তিনি লিখেছেন ঃ

''আমরা বিশৃংখলা বা গোলমালের সন্তান গভীর কাঠামোগত পরিবর্তন হলো ধ্বংস। সব
কিছুর গভীরে রয়েছে দূর্নীতি, অপ্রতিরোধ্য বিশৃংখলার ঢেউ, সর্বশান্ত হওয়াই উদ্দেশ্য।
কোন রকম দিক নির্দেশনাহীন জীবন যাত্রা। এই অন্ধকারাচ্ছন্নতা আমাদের স্বীকার করতে হবে। আমরা যদি গভীরভাবে সন্ধান করি তাহলে বিশ্বব্রমান্ডে এক ধরনের অরাজকতাই দেখতে পাই''

প্রখ্যাত জার্মান ডারউইনবাদী ও বর্ণবাদী দার্শনিক **Nietzschei** তার বর্ণবাদী চিন্তাধারায় হিটলারের ''আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব'' মতবাদের তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করেন। তিনি বলেছেন, জীবনকে ''হতাশাবঞ্জক'' বলে মনে করতে হবে। **Nietzschei** এর তুচ্ছবাদ মূলতঃ এ মতাদর্শের সমর্থন করে থাকে। মানুষ নিশ্চয়ই কোন না কোন মহান উদ্দেশ্যের জন্য বেঁচে থাকে। **Nietzschei** যিনি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁর ধারনা অনুযায়ী মানুষের জন্মের উদ্দেশ্যের সাথে সৃষ্টিকর্তার কোন সম্পর্ক নাই। এ কারনে তার মতে মানুষ সব সময় তার জীবনের উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তা না পেয়ে সে হতাশা ও নৈরাশ্যজনক ভাবধারায় পতিত হয়। মানুষের উচিত তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা। কিন্তু **Nietzschei** এর চিন্তাধারা অনুযায়ী যদি কেহ তার জন্মের মূল উদ্দেশ্য অস্বীকার করে তাহলে অবশ্যই সে তা খুঁজে পাবে না। এ ক্ষেত্রে **Nietzschei** এক ধরনের পাগলাটে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

মহান আল্লাহতালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে সমাজব্যবস্থা এ মহাসত্যকে ভূলিয়ে দেয়। সেই সমাজ অতি অবশ্যই একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ধ্বংসের শিকার হয়ে থাকে। ধনসম্পদ, জনকল্যান ও

অর্থনৈতিক অগ্রগতি যাই হোক না কেন, সে সমাজ কখনও শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয় না। ফলে জনসাধারন সাধারন বিবেকের দাবী অনুযায়ী তাদের চরিত্রকে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। তাই তাঁরা নিজেদেরকে বলগাহীন ও উদ্দেশ্যহীন প্রানী হিসাবে নিজেদেরকে বিবেচনা করে যে কোন ধরনের অবৈধ ও অনৈতিক কাজ করতে পিছপা হয় না। এ কারনে তারা হতাশা, অসুখী ও হতাশাগ্রস্ত প্রানী হিসাবে কাল কাটায়। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ যে, তারা মনে করে তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তারা শুধু মৃত্যুর পরই জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন, সে আল্লাহর দয়া, অনুকম্পা লাভের ও বেহেশতের আশায় জীবনপাত করে থাকে। তার জীবনে যাই ঘটুক না কেন সে আল্লাহ কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এ কারনে সে কখনও হতাশা বা অবসাদগ্রস্ততা বা নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয় না।

ডারউইনবাদের বিষবাষ্প নিষ্কাশন করা অপরিহার্য।

মানব ইতিহাসের সকল যুগেই যুদ্ধ, সংঘাত, অত্যাচার ও খুন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ডারউইনবাদ মিথ্যা ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মুখোশের আবরন ব্যবহার করেছে। বিংশ শতকে তার ফলে যে সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত অত্যাচার ও যুদ্ধের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এর ব্যাপ্তি ও বিস্তার পৃথিবীর ইতিহাসের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। জীবনের সৃষ্টি ও বিকাশ সম্বন্ধে ডারউইনবাদের সম্পূর্ন বিভ্রান্তিকর দাবী ও ধারনা এ সব মতাদর্শ তথা দর্শন গুপ্তঘাতক, স্বৈরশাসক, বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন পীড়নকারী সকলের কর্মকান্ডকেই এক ধরনের নৈতিক সমর্থন দান করে বলেছে - এটা হলো ‘‘ প্রাকৃতিক আইন ’’ যা প্রানী ও উদ্ভিদ জগতের মত মনুষ্য সমাজে সমভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের সময়ে বিবর্তনবাদকে দার্শনিক ও আদর্শিক কারনে যৌক্তিক হিসাবে সমর্থন প্রদান করা হয়। বিংশ শতকে উপনিবেশবাদে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেছিল। জার্মানীতে নাজীবাদ, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র অতীতের ঘটনা হিসাবে পরিগনিত। কিন্তু ডারউইনবাদী বস্তুবাদী দর্শন যা এ সমস্ত মতাদর্শের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত তা বর্তমানেও অত্যন্ত জোরেশোরে কোন কোন মহল কর্তৃক সমর্থন ও সুরক্ষা করা হয়। তাই এ দর্শনের নীরব উপস্থিতি তথা প্রভাব পৃথিবীর সকল ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে অনুভব করা যায়। মানব সমাজে বিপর্যয়ে ডারউইনবাদের ভুমিকা সম্পর্কে **Kenneth J. Hsu** ব্যক্তিগতভাবে একজন ডারউইনবাদী হওয়া সত্ত্বেও লিখেছেন যে ঃ

‘‘ আমরা একটি নিষ্ঠুর সামাজিক মতাদর্শের অসহায় শিকার, যা এমন শিক্ষাই দেয় যে, ব্যক্তি, শ্রেনী ও জাতি সমূহ এক কঠিন প্রতিযোগীতায় অবতীর্ন, আর এটাই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। এটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ স্বভাবতই তাদের থেকে ক্ষুদ্র বা নীচুদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আইন কোন বিজ্ঞান নয় বরং এটা একটি শয়তানী বা ভ্রষ্ট সামাজিক মতবাদ।’’

একারনেই বিচারিক বা বাহ্যিক সর্তকর্তা মূলক ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহন করতে হবে। এ সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে এই সামাজিক ডারউইনবাদের দুষ্টক্ষতকে আবরন দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র।

এর স্থায়ী সমাধান রয়েছে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক চিকিৎসায়। অর্থাৎ সমাজের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট থেকে ডারউইনবাদের অপসারন বা ধ্বংসের সাথে সাথেই যে সমস্ত মতাদর্শ এর থেকে শক্তি বা রস আহরন করত তা অদৃশ্য বা শেষ হয়ে যাবে। আর এর অর্থ হলো আল্লাহর ইচ্ছায় সমাজ তথা পৃথিবীর সকল অত্যাচার ও নিপীড়নের চিরস্থায়ী অবসান।

এ কারনে ঈমানদার, বিবেকবান ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পন্ন লোকদের উপর একটি গুরু দায়িত্ব রয়েছে। ডারউইনবাদ বিগত শতকের পৃথিবীতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি ও জন দুর্ভোগের কারন ছিল তা ভুলে যাওয়া বা একে অবমূল্যায়ন করা একটি বড় ধরনের ভুল হবে। যিনি এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে অনুধাবন করেছেন, তিনি এই মতাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক আক্রমন তথা আন্দোলন বা প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন, যাতে করে বিগত ১৫০ বৎসরের এই মহা প্রবঞ্চনা সমাজ থেকে সম্পূর্ন নির্মূল হয়ে যায়। এই প্রবঞ্চনামূলক মতাদর্শ সমাজ থেকে অপসারন করার একটি মাত্র পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো, মানব জাতির সম্মুখে যত প্রশ্ন বা সমস্যা রয়েছে তার যথাযথ সমাধান। পবিত্র কোরানের নৈতিক চরিত্রের সার্বিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এটা হওয়া সম্ভব। এ সমস্ত বিপর্যয়, দুঃখ-দুর্দশার তখনই অবসান হবে, যখন জনগন ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাসী হবে। পবিত্র কোরান অনুযায়ী যখন সুন্দর, স্নেহ, মমতা, প্রেম, দয়া, সুবিচার, সহযোগীতা ও ধৈর্য সমাজে বিরাজ করবে। পবিত্র কোরানের একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে - ‘‘ সত্য আসবে মিথ্যা দূর হয়ে যাবে ’’ বলুন সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই(সুরা- ইশরা বানিইসরাইল-৮১)।

পরিশিষ্ট

ডারউইনবাদ অথবা বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটি ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, যা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু সে উদ্দেশ্যে সাধনে এটা ব্যর্থ হয়েছে । এ মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে জীবনের সূচনা হয়েছে অজৈব পদার্থ থেকে পর্যায়ক্রমিক দৈবাৎ সংঘটিত ঘটনাবলীর সংমিশ্রনে। এই মতবাদ নানাভাবে নিন্দিত হয় যখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই বিশ্ব ব্রাক্ষ্মান্ড প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তালা সৃষ্টি করেছেন । মহান আল্লাহতালা যিনি এ বিশ্ব অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াদিও এ শৃঙ্খলার আওতাভুক্ত করেছেন । পক্ষান্তরে এ মতবাদের দাবী অনুযায়ী পৃথিবীর প্রাণীকূল আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেন নাই বরং দৈবাৎ সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে এটা সত্য বলে মেনে নেয়ার কোন সুযোগ নাই ।

আমরা ডারউইনবাদ পর্যালোচনা করে সত্যিই দেখতে পাই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষনায় এ তত্ত্বের কোন ভিত্তি নাই । অজৈব পদার্থের তুলনায় জৈব প্রাণের সৃষ্টি কাঠামো অনেক বেশী জটিল ও অভিনব । উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, অজৈব পদার্থের অনুগুলো কিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরন্তু এ অণুগুলো আবার কিভাবে জটিল কাঠামোর আওতায় প্রাণী জগতে সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে । আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পাই কি অসাধারণ কৌশল ও প্রক্রিয়ায় এগুলোকে বিন্যাস করা হয়েছে যেমন, প্রোটিন, ক্রোমজম ও এনজাইম প্রভৃতি ।

জীব জগতের এ অসাধারণ কর্মকান্ড পর্যবেক্ষনের পর বিংশ শতকে বিবর্তনবাদ বাতিল বা মিথ্যা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা এ বিষয়টি পুংখানুঙ্খ আমাদের অন্য প্রকাশনা সমূহে পর্যালোচনা করেছি এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে । কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তা এখানেও পুনর্ব্যক্ত করা হলো ।

ডারউইনবাদের পতনের কারণ

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বিবর্তনবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে, এ মতবাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে প্রাচীন গ্রীস দেশে এর উৎস পাওয়া যায় । ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের ঝবন **Origin of Species** প্রকাশিত হওয়র পর এ মতবাদ বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রজাতি আলাদাভাবে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, এ পুস্তকে ডারউইন এ ধারনার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহন করেন । ডারউইন দাবী করেন সকল প্রজাতি একটি সাধারণ পূর্ব পুরুষ **(Common Ancestor)** থেকে সময়ের বিবর্তনে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে ।

ডারউইন নিজেই বলেছেন যে, তার এ মতবাদ কোন মজবুত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং এ তত্ত্ব স্বাভাবিক যুক্তির ক্রমবৃদ্ধির একটি পর্যায়ক্রম ব্যাখ্যা মাত্র ।

প্রকৃতপক্ষে ডারউইন তার পুস্তকের একটি অধ্যায়ে **The Difficulties on Theory** শিরোনামে নিজেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যার কোন উত্তর তার নিজেরই জানা ছিল না । ডারউইন ধারনা করেছিলেন পরবর্তীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে তার অজানা প্রশ্ন সমূহের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে ফলে তার মতবাদকে সমর্থন প্রদান করতে সহায়তা করবে । কিন্তু দুঃখের বিষয় ডারউইনের এ প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটেছে । অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাধনের মাধ্যমে ডারউইনবাদের মূল দাবীগুলোই একের পর এক অবৈজ্ঞানিক ও ভিত্তিহীন হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে ।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ডারউইনবাদ তিনটি শিরোনামে বিভক্ত করে পর্যালোচনা করা যায় তা হলো ঃ

(১) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জীবনের উন্মেষ কিভাবে সংঘটিত হলো তার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে না।
(২) এ তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় সংঘটিত ঘটনা সমূহের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুজে না পাওয়া।
(৩) প্রাপ্ত জীবাশ্ম প্রমানাদি এ তত্ত্বের ঠিক বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে ।

আমরা এ অধ্যায়ে বর্ণিত শিরোনাম বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো ।

প্রথম অলংঘনীয় বাধা ঃ প্রাণের উৎস

ডারউইনের দাবী অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রাগৈহিতাসিক যুগের প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি মাত্র কোষ থেকে সকল প্রজাতির সৃষ্টির উন্মেষ হয়। কেমন করে একটি মাত্র কোষ থেকে লক্ষ লক্ষ জটিল প্রজাতি সমূহ সৃষ্টি হতে পারে, আর যদি হয়েই থাকে তার কোন জীবাশ্ম প্রমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে না পাওয়ার কারণই বা কি এর সদুত্তর এ মতবাদের ভিতর পাওয়া যায় না । কিন্তু এ সমস্ত আলোচনার পূর্বে আমরা প্রথমেই বিবর্তনের আলোচ্য সময়কালটা কখন এবং কিভাবে এই প্রথম কোষের আবির্ভাব ঘটে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো । বিবর্তনবাদ যেহেতু সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কোন আধিভৌতিক সত্ত্বার বা শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাই এ মতবাদ দাবী করে যে, প্রথম কোষটি কোন প্রকার পরিকল্পনা বা শৃংখলার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নাই বরং তা হঠাৎ করে প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী স্বতঃস্ফুর্তভাবে এটা অস্তিত্বে এসে যায় । অন্য কথায় এ মতবাদের দাবী অনুযায়ী অজৈব পদার্থ থেকে এ প্রাণী কোষ অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে । এ ধারনা জীব বিজ্ঞানের মৌলিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিধায় তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ।

জীবন থেকে জীবন আসে

ডারউইন তার পুস্তকে জীবনের উৎস সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি । তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক উন্নতি অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকার কারণে তিনি ধারনা করেছিলেন প্রাথী জগত অতি সরল কাঠামোর সৃষ্টি। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রজাতি সমূহের স্বতঃস্ফূর্ত জন্ম তত্ত্ব মতবাদ অনুযায়ী ডারউহনও বিশ্বাস করতেন অজৈব পদার্থ থেকে দৈবাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জীবনের বিকাশ ঘটে থাকে এবং তিনি এ ধারনা তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বেও ব্যবহার করেন । সেই সময়কার সাধারণ বিশ্বাস ছিল খাদ্য দ্রব্যের উচ্ছিষ্ট থেকে বিভিন্ন কীটের জন্ম হয়ে থাকে বা গম থেকে পোকা সৃষ্টি হয়। এ ধারনা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। বস্তার উপর গমের কিছু অংশ রেখে দেওয়া হতো ধারনা করা হতো কিছুক্ষন পর এখানে উকুন বা পোকা সৃষ্টি হবে । মাংসের উপর পোকার ডিমের অস্তিত্বকে অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণের সঞ্চারের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হতো । যদিও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে মাংসের উপর পোকার ডিম স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয় না বরং পরিবাহিত লার্ভা যা খালি চোখে দেখা যায় না, তা থেকে ডিমের সৃষ্টি হয়ে থাকে ।

ডারউইন যখন তার এ পুস্তক **The Origin of Species (১৮৫৯)** লিখেন তখন পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকদের সাধারণ ধারনা ছিল যে, অজৈব পদার্থ থেকে জীবানু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে । ডারউহনের এ পুস্তক মুদ্রনের মাত্র ৫ বৎসরের মধ্যে ফরাসী জীব বিজ্ঞানী **LOUIS PASTEUR** বিবর্তনবাদের মূল ভিত্তি ভুল প্রমাণ করেন । দীর্ঘ গবেষনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর **LOUIS PASTEUR** বলেন, অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণের সঞ্চার হয় এ ধারনা চিরদিনের জন্য কবরে প্রোথিত করা হলো । ডারউইনবাদীরা পাস্তরের এ মতবাদ প্রচারে দীর্ঘদিন যাবত বাধা দিয়ে আসছিলেন । কিন্তু এটা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীব জগতের কোষের জটিল কাঠামো অবধারিতভাবে প্রমাণিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের উন্মেষ ঘটে এ তত্ত্ব তা বাতিল হিসাবে গণ্য হয় ।

বিংশ শতকে অপেশাদারী সংগ্রাম

বিংশ শতকে রাশিয়ার বিখাত জীব বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদী **Alexandar Oparin** সর্বপ্রথম জীবনের উৎস সম্পর্কে গবেষনা শুরু করেন । ১৯৩০ দশকে বেশ কিছু মতবাদে **Oparin** জীবনের সূচনা দৈবাৎ হয় মর্মে দাবী করতে থাকেন । তবে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অবশ্য তিনি নিজেই তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, পুরো বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যে কোষের উৎসের বিষয়টি সবচেয়ে অন্ধকার (দুর্বলতম) দিক বা অংশ ।

বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিকরা জীবনের উৎস সম্পর্কে সমাধান পাওয়ার লক্ষে **Oparin** এর তত্ত্ব অনুযায়ী গবেষনা চালিয়ে যান । এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন আমেরিকার রাসায়নবিদ **Stanley Miller,** তিনি ১৯৫৩ বিজ্ঞানাগারে/গবেষনাগারে গ্যাস, শক্তি, পৃথিবী সৃষ্টির আদিম অবস্থান ও কিছু জৈব অণু (এমিনো এসিড) মিশ্রিত করে প্রোটিন সৃষ্টির চেষ্টা করেন । এই গবেষনার ব্যর্থতা সেই সময় বিবর্তনবাদের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত । যে আবহাওয়ায় এ গবেষনা পরিচালনা করা হয় পৃথিবীর বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল মর্মে পরবর্তীতে জানা যায় । দীর্ঘ নীরবতার পর খভররনক্ষ স্বীকার করেন, যে পরিস্থিতি ও আবহাওয়ায় এ গবেষনা পরিচালনা করা হয়েছিল তা প্রকৃত অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলনা ।

জীবনের উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার এ প্রচেষ্টা পুরো বিংশ শতক ধরে চলতে থাকে এবং যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৯৮ সালে বিবর্তনবাদী সাময়িকী **EARTH H SCIPPS Institute, SAN Diego, Hl Geo Chemist, Geffery Ada** তার এক প্রবন্ধে এ সত্য প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন ঃ

আমরা বর্তমানে বিংশ শতকে বসবাস করছি । আমরা এখনও সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি তাহলো পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ কিভাবে সম্ভব হলো?

জৈব কাঠামোর জটিলতা

বিবর্তনবাদীদের প্রাণের উৎসের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন এ কারণেই উত্থাপিত হয় যে, সাধারণভাবে সবচেয়ে সরল প্রকৃতির প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সে সব প্রাণীর জৈব কাঠামো অবিশ্বাস্যভাবে জটিল। মানব জাতি যত বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে তার চেয়ে একটি জীবন্ত কোষ অনেক বেশী জটিল । তাছাড়া পৃথিবীর সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষনাগারেও একটি জীবন্ত কোষ তৈরী করা সম্ভব নয় ।

একটি কোষ সৃষ্টির জন্য যেসব পরিস্থিতি ও শর্ত প্রয়োজন তা কোনক্রমেই দৈবাৎ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়না। প্রোটিন সৃষ্টি ও কোষ নির্মানের বিভিন্ন অংশ একই সাথে দৈবাৎ একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ৫০০ এমিনো এসিড সৃষ্ট হওয়ার ৯৫০ বারে একবার মাত্র । অংক শাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী ১০৫০ এর মধ্যে ১ হলে তা বাস্তবে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব । উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, **DNA** অণু যা নিউক্লিয়াস এর মধ্যে অবস্থান করে । এই **DNA** এর মধ্যে মানুষের জন্ম বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত থাকে । মানুষের **genetic code** যদি কাগজের উপর লিখা হয় তাহলে ৫০০ পৃষ্ঠার ৯০০ বই হবে । **DNA** সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত তথ্য হলো এটার প্রতিরূপ হিসাবে কাজ করতে হলে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন বা এনজাইমের প্রয়োজন হয়। এগুলো শুধু তখনই **DNA** এর কোড এর মাধ্যমেই কার্যকর হয় । এটা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । তাই এদের প্রতিরূপ হওয়ার জন্য একই সাথে উপস্থিতি প্রয়োজন হয় । এ কারণেই পৃথিবীকে প্রাণের উৎস সম্পর্কিত অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় ।

১৯৯৪ সালের অক্টোবর, **Scientific American** সাময়িকীতে সান ডিয়াগো ক্যার্লিফোনিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর **Leslie orge** লিখেছেন ঃ

প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড উভয়েরই কাঠামোগত প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির তাই এ দুটি একই সমতালে বিক্রিয়া করে নতুন সৃষ্টির বিষয়টি কার্যত অসম্ভব । তাছাড়া এ দুটির একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্বও অসম্ভব । ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে কাউকে এ ধরনের সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবেই যে, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে প্রাণ কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি বা উদ্ভুত হয় নাই ।

বিবর্তনবাদের কল্পিত কাঠামো

ডারউইন তত্ত্বের দ্বিতীয় দুর্বল দিক যার মাধ্যমে তত্ত্বটি বাতিল প্রমাণিত হয় তাহলো, ডারউইনবাদ প্রমাণের জন্য বিবর্তনবাদী পদ্ধতি হিসাবে যে দুটি মতবাদ উত্থাপিত হয় বাস্তবিকপক্ষে তার মধ্যে কোন বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়াই নাই ।

ডারউইন তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করে উপস্থাপন করেছেন । এই প্রক্রিয়াকে তিনি এতই গুরুত্ব প্রদান করেছেন যা তার পুস্তকের নাম করনের মাধ্যমেই বোঝা যায়, - **The Origin of Species, By means of Natural Selection.**

এটা এই ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রকৃতিতে প্রজাতি সমূহের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যে সংগ্রাম হয়ে থাকে তাতে শক্তিশালী যারা তারা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয় এবং টিকে থাকে বা এ সংগ্রামে জয়ী হয় । উদাহরন স্বরূপ বলা হয় যে, যখন কোন হরিণের দল হিংস প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন যে হরিণটি সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম হয় সেই বেঁচে থাকে । এভাবে এ হরিণের দলটি দ্রুত বিচরন শক্তিশালী হরিণদের সমন্বয়ে গঠিত হবে । কিন্তু তাই বলে এই প্রক্রিয়ায় হরিণগুলো বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ঘোড়ায় পরিণত হয় না । এ কারণেই বিবর্তনবাদের এ কর্ম পদ্ধতির মধ্যে কোন বিবর্তনবাদী শক্তি নিহিত নাই । ডারউইন তার তত্ত্বের এ দুর্বল দিক সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন, তিনি নিজেই স্বীকার করে তার **The Origin of Species** পুস্তকে বলতে বাধ্য হয়েছে অনুকূল ও ব্যতিক্রমধর্মী পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে প্রাকৃতির নির্বাচন কোন ভূমিকাই রাখতে সক্ষম হয় না ।

ল্যামার্কের প্রভাব

তাহলে কিভাবে এই ব্যতিক্রমধর্মী পরিবর্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব । তদানীন্তন সেকেলে সীমিত বিজ্ঞানি ল্যামার্ক, ফরাসী জীববিজ্ঞানী জ্ঞান দিয়ে ডারউইন, ল্যামার্ক এর তত্ত্বের মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সচেষ্ট হন। তিনি ডারউইনের পূর্বে এক মতবাদ প্রচার করেন । তিনি দাবী করেন, প্রাণী জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত শারীরিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট সমূহ পরবর্তী প্রজন্মে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে এবং এ ধারা বংশ পরস্পরায় অব্যাহত থাকে । ল্যামার্ক এর ধারনা অনুযায়ী জিরাফ এমন একটি প্রাণী, যা হরিণ থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় তার গলা বংশ পরস্পরায়

সংগ্রামের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে বর্তমানে তার লম্বা গলা দিয়ে লম্বা গাছের পাতা খেতে সক্ষম হচ্ছে ।

ডারউইন তার - **The Origin of Species** পুস্তকে এ ধরনের আরো উদাহরন পেশ করেছেন। যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন কিছু সংখ্যক ভালুক খাদ্যের সন্ধানে পানিতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে তিমিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বিংশ শতকে **MENDEL** প্রাণী জগতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বংশ বিজ্ঞান বিষয়ক মতবাদ প্রচার ও প্রমাণ করেন তার মাধ্যমে এ সকল তথাকথিত অর্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর সম্পর্কীয় কল্পকাহিনী বাতিল ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবেচিত হয় । এ কারণে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কর্ম পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায় ।

নব্য ডারউইনবাদ ও এর সংশোধন

ডারউইনবাদীরা এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের লক্ষে একটি আধুনিক সিনথেটিক মতবাদ বা নব্য ডারউইনবাদ প্রচার শুরু করে, যা ১৯৩০ দশকের শেষভাগে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে । এবার তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে "ব্যতিক্রমধর্মী অনুকূল পরিস্থিতির" বা পরিবর্তনশীলতার কারণ অথবা প্রাণীর জ্বীবজঞ্জ ঘটিত ত্রুটি বা দোষ যা রেডিয়েশন বা ডুপ্লিকেশন ভুলের জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে মর্মে দাবী করেন । বর্তমানে ডারউইনবাদী এই নতুন মডেল অনুযায়ী নব্য ডারউইনবাদ কার্যকর হিসাবে বিবেচনা করে এর সমর্থন করে থাকেন । এ তত্ত্ব অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ প্রজাতি জন্মগত ত্রুটি বা পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে । সময়ের বিবর্তনে জটিল প্রক্রিয়ায় এসব প্রাণীতে কান, চোখ, ফুসফুস, ডানা সৃষ্টি হচ্ছে । কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য যা এ মতবাদকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয় তাহলো ঃ পরিবর্তনশীলতা প্রাণী জগতের বিকাশ ঘটায় না বরং তা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করে- এর সহজ কারণ হচ্ছে **DNA** অতি জটিল কাঠামো, এতে সামান্য পরিবর্তন ও অণুর গঠন প্রক্রিয়ায় তা ক্ষতিসাধন করে মাত্র । আমেরিকান **Scientist B G Ranganthan** তা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ পরিবর্তনসমূহ, ক্ষুদ্র, এলোপাথাড়ি ও ক্ষতিকারক যার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকার্যকর । পরিবর্তন ধারার এই চারটি বৈশিষ্ট এটাই প্রমাণ করে যে, তা কোন বিবর্তনবাদী উন্নয়ন বা বিকাশ প্রক্রিয়ায় কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয় । কোন বিশেষ ধরনের প্রজাতির ক্ষেত্রে এটা অকার্যকর অথবা ক্ষতিকারক হিসাবে বিবেচিত । একটি ঘড়ির এলোপাথাড়ি বা অপরিকল্পিত পরিবর্তন কখনও ঘড়িটির গুনগত পরিবর্তন সাধন করেনা বরং সেটা ক্ষতিগ্রস্থ করে বা অকার্যকর হয় । একটি ভূমিকম্প কখনই নগর উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখেনা বরং তার ধ্বংস সাধন করে মাত্র ।

প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যকর বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, বংশ বিজ্ঞানে গবেষনায় পর্যবেক্ষন করা যায়নি বরং গবেষনায় এটাই দেখা গেছে সকল প্রকার পরিবর্তনই ক্ষতিকারক । এটাই প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, বিবর্তনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবর্তন সমূহ বংশগত বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা শুধু প্রাণীকে পঙ্গু বা ধ্বংসই করে থাকে । মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাধারণ কোষীয় পরিবর্তন হলো ক্যান্সার । তাই কোন ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া কোনক্রমেই বিবর্তনবাদী পদ্ধতি বা কৌশল হতে পারেনা । প্রাকৃতিক নির্বাচন, যা ডারউইন স্বীকার করেছিলেন, তা নিজস্বভাবে কিছুই করতে সক্ষম নয় । আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে,

প্রকৃত সত্য এটাই যে, প্রকৃতিতে কোন বিবর্তনবাদী কৌশল বা পদ্ধতি বলে কিছু নাই । যেহেতু প্রকৃতিতে বিবর্তনবাদী কৌশল নাই, তাই বিবর্তনবাদের তথা কথিত সময়টি একটি কল্পিত ধারনামাত্র যা কখনও বিদ্যমান ছিলনা ।

জীবাশ্ম প্রমাণ ঃ কোন অন্তবর্তীকালীন আকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ/নিদর্শন ।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের ঘটনা যে, কখনও ঘটেনি তার সবচেয়ে বাস্তব প্রমাণ হলো জীবাশ্মের আস্তিত্বের অনুপস্থিতি ।

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সকল জীবিত প্রাণী পারস্পরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান আকার/আকৃতি ধারন করেছে । একটি পূর্ববর্তী প্রার্ণী সময়ের বিবর্তনে অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয় । সকল প্রাণীই এভাবেই বিকাশ লাভ করেছে । এই মতবাদ অনুসারে এ প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ বছর সময়কালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বর্তমান পর্যায়ে উন্নত হয়েছে । এ কারণে অগনিত মধ্যবর্তী প্রজাতি এ সময়কালে বিদ্যমান ছিল যাদের পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হতো ।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি মৎস্য যা বর্তমান আকার আকৃতিতে বিদ্যমান । তারা বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে সরীসৃপ আকার ধারন করেছিল, আধামাছ-আধাসরীসৃপ আকারেও তারা অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। অথবা সরীসৃপের আকার বহাল থাকাকালীন সময়েই তারা পক্ষীকুলের কিছু বৈশিষ্ট ধারন করেছিল, সেক্ষেত্রে সরীসৃপ-পক্ষী অবশ্যই বিরাজ করত । যেহেতু তারা বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করছিল, তাই তারা অবশ্যই দুর্বল, অসুস্থ, অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ প্রাণী হিসাবে পৃথিবীতে চলাফেরা করত । বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুযায়ী এ ধরনের অন্তবর্তী আকার/আকৃতি সম্পন্ন প্রাণী অবশ্যই অতীতকালে বিদ্যমান ছিল ।

সত্যিই যদি এ ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে এ সকল প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের আকার ও আকৃতি থাকা এবং এদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক । তাই এ ধরনের অদ্ভুত আকৃতির বিভিন্ন প্রজাতির অস্তিত্বের কোন না কোন চিহ্ন বা প্রমাণ বা নিদর্শন অর্থাৎ যার জীবাশ্ম প্রমাণ থাকা উচিত ।

ডারউইন তার পুস্তক **The Origin of Species** এভাবে উপস্থাপন করেছেন । আমার বিবর্তনবাদ মতবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে অসংখ্য অন্তবর্তীকালীন প্রজাতির যার সাথে একই ধরনের প্রজাতির গভীর মিল সম্পন্ন প্রজাতির অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে । ফলে এ ধরনের পূর্বেকার প্রজাতির অস্তিত্ব সম্বলিত জীবাশ্মের প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে ।

ডারউইনের আশাভংগ

ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল আনাচে কানাচে জীবাশ্ম গবেষনা পরিচালনা করা সত্ত্বেও এ ধরনের কোন অন্তবর্তী আকার বা প্রকারের কোন প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি । এ সকল খনন কাজের মাধ্যমে যে সমস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার সাথে বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কিছুই পাওয়া যায় নাই, বরং জীবাশ্ম পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে, প্রজাতি সমূহ পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণরূপে হঠাৎ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে । কোন অন্তবর্তী প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি ।

একজন বিবর্তনবাদী জীবাশ্ম বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও **DEREK W AGER** বিষয়টি স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা যদি জীবাশ্ম প্রমানাদি পূর্বাপর পর্যবেক্ষন করি প্রজাতি অনুযায়ী বা এর বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী-তাহলে কোন পর্যায়ক্রমিক বিকাশ দেখা যায় না বরং হঠাৎ করে একটি প্রজাতির আবির্ভাব বা অন্য একটি প্রজাতির তিরোধানই দেখতে পাওয়া যায় । অন্য কথায় জীবাশ্ম সমূহের পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, সকল প্রজাতি সমূহ হঠাৎ করে পূর্ণাঙ্গরূপে বা আকার আকৃতিতে বিদ্যমান, কোন অন্তবর্তীকালীন আকার/আকৃতিতে তাদের দেখতে পাওয়া যায়নি । অর্থাৎ ডারউইন যা পূর্বানুমান বা ভবিষ্যবানী করেছিলেন বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে এর বিপরীত । উপরন্তু প্রজাতি সমূহ যে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এটা তারই বাস্তব প্রমাণ । প্রজাতি সমূহ কোনরূপ পূর্ব পুরুষ ব্যতীত, ক্রটিহীন এবং হঠাৎ করে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, প্রজাতি সমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে । প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিবর্তনবাদী জীব বিজ্ঞানী **DOUG LAS FUTUYMA** এই সত্যকে স্বীকার করে বলেছেন ঃ

প্রজাতিসমূহের সৃষ্টি বা বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় গঠিত এই দুয়ের মাঝে প্রাণী সমূহের সূচনার সম্ভাব্য বাখ্যা রয়েছে। প্রজাতি সমূহ হয় পূর্ণাঙ্গ অবয়বে বিকশিত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে অথবা সৃষ্টিই হয় নাই । যেহেতু পূর্বের কোন প্রাণী থেকে পরিবর্তন বা বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কোন প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি । বরং প্রজাতি সমূহ পূর্ণাঙ্গ অবয়বে সম্পূর্ণ বিকশিত পর্যায়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে । তাই এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রজাতি সমূহকে বিজ্ঞানময় এক মহা সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন ।

জীবাশ্ম এটাই প্রমাণ করে যে, প্রজাতিসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও সুচারুরূপে গঠিত । অন্য কথায় ডারউইনের চিন্তার বিপরীত প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ প্রজাতি সমূহ বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় নয় বরং সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ধরাধামে উপনীত হয়েছে ।

বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় মানব সৃষ্টির কল্পকাহিনী

বিবর্তনবাদের প্রবক্তারা সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসেন, তাহলো মানুষ সৃষ্টির উৎস বা মানব সৃষ্টির রহস্য । ডারউইনবাদীরা এ বিষয়ে দাবী করে থাকেন যে, আধুনিক মানুষ কিছু সংখ্যক বানর প্রজাতির পূর্ব পুরুষ থেকে বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে । এ দাবী অনুযায়ী প্রায় ৪ থেকে ৫ মিলিয়ন বছর সময়কাল থেকে শুরু হয়েছে এবং পৃথিবীতে আধুনিক মানুষ ও তার পূর্ব পুরুষদের অর্ন্তবর্তী আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রজাতি বসবাস করতো। এ কল্পিত ধারনা অনুযায়ী মানুষ মূলত ৪ পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে, তাহলো ঃ

1. **AUSTRALOPITHECUS**
2. **HOMO HABILIES**

3. **HOMO ERECTUS**
4. **HOMO SAPIENS**

বিবর্তনবাদীরা মনুষ্য প্রজাতির তথাকথিত সর্বপ্রথম পূর্বপুরষদের নামকরন করেছেন **Australo Pithectus** যার অর্থ দক্ষিনের বানর । প্রকৃতপক্ষে এই **Australo Pithectus** হলো এক বিলুপ্ত প্রজাতির বানর । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের দুই বিশ্ববিখ্যাত **Anatomist, Austrolopethicist** সম্পর্কে ব্যাপক গবেষনার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, এটা একটি লুপ্ত প্রজাতির বানরের বংশ যার সাথে মানুষ প্রজাতির শারীরিক কাঠামোর কোন মিলই নাই ।

বিবর্তনবাদীরা মনুষ্য প্রজাতির পরবর্তী বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়াকে এষলষ বা মানব শ্রেনী হিসেবে বিভাজন করেছেন । এ দাবী অনুযায়ী এষলষ শ্রেনীভুক্ত প্রজাতি **Australopithecus** শ্রেনী থেকে অধিকতর উন্নত বা বিকাশিত । বিবর্তনবাদীরা এ সকল জীবাশ্মের পর্যায়ক্রমিক শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী মনুষ্য প্রজাতির একটি কল্পিত বিবর্তনবাদী পরিকল্পনা প্রস্তত করেন । মনুষ্য সৃষ্টির এ ক্রমবিকাশের পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে একটি কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয় । কারণ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কোন বিবর্তনবাদী মিল পরিলক্ষিত হওয়ার কোন প্রমাণ না পাওয়ায় বিষয়টি অপ্রমাণিত । বিংশ শতকের একজন বিবর্তনবাদের কট্টর সমর্থক **Ernst Mayr** এ কথা স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ বংশ তালিকায় **Homo Sapiens** পর্যন্ত কোন সূত্র **(Chain)** পাওয়া যায়নি বা এ সূত্র হারিয়ে গেছে ।

মনুষ্য প্রজাতির সৃষ্টি পরিকল্পনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবর্তনবাদীরা **Australopithe-cus>Homo Habilis>Homo erectus>Homo Sapiens** এই বংশানুক্রম অনুসরন করা হয়েছে মর্মে দাবী করেন । পক্ষান্তরে জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, **Australopithecus, Homo habilis J Homo erectus** একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতো । তাছাড়া **Homo erectus** শ্রেনীভুক্ত প্রাণী অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। গবেষনায় দেখা গেছে যে ঃ

"Homo sapiens (আধুনিক মানুষ) **neandertalensis J Homo erectus** একই সময়কালে পাশাপাশি পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকে ।

এ থেকেই প্রমানিত হয় যে, মনুষ্য প্রজাতির পূর্ব পুরুষ সম্পর্কিত তত্ত্ব একেবারেই ভিত্তিহীন তথা কল্পিত।

Harvard University এর বিখ্যাত জীবাশ্ম বিজ্ঞানী, **Stephen Jay Gould** যিনি নিজে একজন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও ডারউইনবাদের এ উভয় সংকট এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

আমাদের (বংশ লতিকার) সিঁড়ির তিন প্রজাতি-**Africanus, Australopithecines J Homo habilies** এর কোন প্রজাতিই কারো থেকে উদ্ভুত হয়নি । তাছাড়া এই তিন শ্রেনীর কোন শ্রেনীর মধ্যে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় কোন ধরনের বিবর্তনের লক্ষন পর্যবেক্ষন করা যায়নি ।

অর্থাৎ স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকে বা সিনেমায় মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তনের (অর্ধ মানব-অর্ধ বানরের) যে চিত্র বা ছবি দেখা যায় তা বানোয়াট ও কল্পিত, বৈজ্ঞানিক গবেষনায় এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি । এগুলো শুধুমাত্র বিবর্তনবাদীদের প্রচারনা হিসাবে এ তত্ত্ব জিইয়ে রাখার এটি একটি অপকৌশল মাত্র ।

ব্রিটেনের একজন সম্মানিত ও বিখ্যাত বিবর্তনবাদী **Lord Sobly Zuckerman** ১৫ বৎসর যাবত **Australophitecus** জীবাশ্ম নিয়ে গবেষনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঞ্জমনুষ্য প্রজাতির বংশ লতিকায় বানর প্রজাতির পূর্ব পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই z

Zuckerman বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর বর্ণালী বিশ্লেষন করেছেন । তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা/প্রশাখার মধ্যে শ্রেনী বিন্যাস করে বৈজ্ঞানিক অথবা অবৈজ্ঞানিক হিসাবে অভিহিত করেছেন, বিজ্ঞানের কোন শাখা যা বাস্তব ভিত্তিক ফলাফলে উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা যারা বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করেন না তাদের কাছে এই বর্ণালী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন উপস্থাপন করেন, **Zuckerman** এর তালিকায় সবচেয়ে সঠিক বা বাস্তব বিজ্ঞান হিসাবে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা । এর পর আসে জীব বিজ্ঞানের স্থান এবং এর পরে সামাজিক বিজ্ঞান সমূহ । এ বর্ণালী বিশ্লেষনের শেষ প্রান্তে রয়েছে যাকে প্রায়ই অবৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে তাহলো-টেলিপ্যাথি, ষষ্টেন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে রয়েছে মানুষের বিবর্তনের মতবাদ । সার্বিক বিষয়টি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

আমরা যদি তাৎক্ষনিকভাবে বাস্তব সত্য বিষয়ক বিজ্ঞান বা তথাকথিত জীব বিজ্ঞান বা মানুষের অতিন্দ্রিয় জ্ঞান বা মানুষের জীবাশ্মের ইতিহাস, সেক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত বিবর্তনবাদীর ক্ষেত্রে সব কিছুই সম্ভব । সেক্ষেত্রে একজন বিবর্তনবাদে গভীর বিশ্বাসী, পরস্পর বিরোধী অনেক কিছু একই সাথে বিশ্বাস করতে পারেন ।

তাই মানব ইতিহাসের বিবর্তন কয়েকজন একপেশে মন্তব্য ও ডারউইনবাদে কিছু সংখ্যক অন্ধ বিশ্বাসীদের কয়েকটি জীবাশ্ম পর্যবেক্ষনের ফসল ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের চোখ ও কানের কর্মপদ্ধতি

মানুষের চোখ ও কান যে অসাধারন পদ্ধতিতে কাজ করে, সে সম্পর্কে বিবর্তনবাদীরা এই কৌশলের কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হন না। আমরা কি জানি আমাদের চোখ কিভাবে কাজ করে ? এ প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে আমরা কিভাবে দেখি এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করি । আলোক রশ্মি কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখের রেটিনার বিপরীত দিক হতে পতিত হয়। এখানে এই আলোক রশ্মি সমূহ বৈদ্যুতিক সিগনালে পরিণত হয়ে মানব মস্তিষ্কের কেন্দ্রের পিছনে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জসষঢ় বা বিন্দুতে পৌছায় । এই বৈদ্যুতিক সিগনাল সমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ছবিতে পরিণত হয় এবং আমরা দেখতে পাই । এই টেকনিক্যাল প্রেক্ষাপটে আমরা বিষয়টি চিন্তা করতে পারি ।

মানব মস্তিস্কে কোন আলো নাই । এর অর্থ হলো মস্তিষ্কের অভ্যন্তরভাগে গভীর অন্ধকার বিরাজমান। এবং মস্তিষ্কের এলাকায় কোন আলো পৌছায় না । মস্তিষ্কের যে জায়গায় দর্শনের কেন্দ্র অবস্থিত উক্ত স্থানটিতে কখনও কোন আলো পৌছাতে পাবেনা । মানুষের জানা মতে এর চেয়ে কোন অন্ধকার জায়গা কোথাও নাই । অথচ আমরা আলোকিত, উজ্বল পৃথিবী দর্শন করে থাকি ।

মানব চক্ষুতে এমন সুক্ষাতিসুক্ষ ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম যে, বিংশ শতকের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিও তা তৈরী করতে সক্ষম হয় নাই । উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, আপনি

যে বইটি পাঠ করছেন, আপনার যে হাত দিয়ে তা ধরে রাখছেন এবং মাথা উচু করে চারিদিকে তাকান, আপনি কি কখনও এই ধরনের সুক্ষ্ম ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব অন্য কোথাও দেখেছেন কি? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টেলিভিশন প্রস্তুতকারক কোম্পানীও এ ধরনের টেলিভিশন **(Screen)** পর্দা আপনার জন্য এ রকম উন্নত ধরনের টেলিভিশন তৈরী করতে সক্ষম হবেনা ।মানব চক্ষুর এই প্রতিবিম্ব ত্রিমুখী, রঙ্গীনও অতি সূক্ষ্ম । শতাধিক বছর ধরে হাজার হাজার দক্ষ প্রকৌশলী এ ধরনের সুক্ষ্ম প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন । এ লক্ষে বিরাট বিরাট কারখানা, পরিকল্পনা, বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন নিয়ে প্রচুর গবেষনা করা হয়েছে কিন্তু এ কাজে তারা সফল হননি । আবার আপনি টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকান এবং আপনার হাতে ধরা বইটির দিকে দৃষ্টি দিন । আপনি অতি অবশ্যই পার্থক্যটা লক্ষ করছেন । টিভি পর্দা দ্বিমাত্রিক ছবি দেখায় পক্ষান্তরে আপনার চক্ষু গভীরতাসহ ত্রিমাত্রিক ছবি প্রদর্শন করে থাকে ।

যদিও বছরের পর বছর হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাপক গবেষনার পর ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে ঠিক, কিন্তু চশমা ছাড়া তা দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া এটা এ ধরনের কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক দর্শন পদ্ধতিতে ছবির পশ্চাদভূমি ঝাপসা ও সম্মুখভাগ কাগজ লাগানোর মত দেখা যায় কিন্তু তা কখনও মানব চক্ষুর মত এত স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম নয় । ক্যামেরা ও টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিবিম্বের মান ক্ষুন্ন হয় ।

বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন যে, মানব চক্ষুর এই সূক্ষ্মতাও স্পষ্টতার কলা কৌশল দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ কোন লোক যদি বলে আপনার ঘরের টেলিভিশন সেটটি স্বতস্ফুর্তভাবে নির্মিত হয়েছে, অর্থাৎ টেলিভিশনের সমস্ত জটিল যন্ত্রাংশ সমূহ একত্রিত হয়ে এ ধরনের একটি অত্যাধুনিক সুন্দর যন্ত্র হিসাবে আপনার ঘরে হাজির হয়েছে যার মাধ্যমে এমন সুন্দর ছবি দেখা যায়, তাহলো তা কি একটি গ্রহনযোগ্য প্রস্তাবনা হতে পারে ?

যেহেতু মানব চক্ষুর চেয়ে নিম্নমানের প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্র হঠাৎ করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় । তাই মানব চক্ষুর মত উন্নত প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্র কোনক্রমেই দৈবাৎ সৃষ্টি হয় নাই । মানুষের কানের ক্ষেত্রে একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য । কানের বাইরের অংশ সব ধরনের প্রাপ্ত শব্দ বহিঃকর্ণ গ্রহণ করে তা মধ্য কর্ণের দিকে ধাবিত হয়। মধ্য কর্ণ এ শব্দ তরঙ্গ তীব্র করে, অন্তঃকর্ণে তা প্রেরন করে, অন্তঃকর্ণ তা বৈদ্যুতিক সংকেত হিসাবে পরিণত করে তা মস্তিষ্কে প্রেরন করে এবং চোখের মতই শ্রবনের বিষয়টি মস্তিষ্কের কেন্দ্রে চূড়ান্ত করা হয়।

চক্ষু ও কর্ণের উৎসের বিষয়টি সমভাবে কার্যকর হয়ে থাকে । অর্থাৎ মস্তিষ্ক আলোর মতই শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে । এতে কোন ধরনের শব্দ প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না । তাই বাইরে যত ধরনের শব্দই হোক না কেন, মস্তিষ্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃশব্দ । তবুও তীক্ষ্ম শব্দও মস্তিষ্ক বুঝতে পারে । আপনার মস্তিষ্ক যদিও শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন তবুও আপনি ঠিকই অর্কেষ্ট্রার বাজনা শুনতে পেয়ে থাকেন । আবার ভিড়ের মধ্যে সব ধরনের গোলমালের আওয়াজ শ্রবন করে থাকেন । যদি এ সময় আপনার মস্তিষ্কে কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করা হতো দেখা যেতো তা সম্পূর্ণভাবে শব্দহীন বা নিঃশব্দ ।

প্রতিবিম্ব বা ছবি গবেষনার মতই মূল শব্দ তরঙ্গ যা সৃজন ও পুনঃ সৃজন কি সম্ভব তা নিয়ে বছরের পর বছর গবেষনা করা হয়েছে । এরই ফলশ্রুতিতে তৈরী করা হয়েছে শব্দ রক্ষক/গ্রহন যন্ত্র **(Sound Recorder)** যাতে মূল শব্দ তরঙ্গ বিশ্বস্ততার সাথে রেকর্ড করা যায় । এসব কলাকৌশল ও

হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের গবেষনা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানব শ্রবন যন্ত্র তথা কর্ণেন্দ্রিয়ের ন্যায় স্পষ্ট, তীক্ষ্ম শব্দ গ্রহন যন্ত্র মানুষ আজ পর্যন্ত তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানীর সর্বোৎকৃষ্ট এ১-উ১ শব্দ গ্রহন যন্ত্রের কথাই চিন্তা করুন, এমনকি এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে শব্দ রেকর্ড করা হলেও কিছু শব্দ তরঙ্গ হারিয়ে যায়, তাছাড়া যন্ত্রটি চালু করলে কোন গান শুরুর পূর্বে এক ধরনের এভড়ড় এভড়ড় শব্দ হয় । অথচ মানব দেহের কলা কৌশলের মাধ্যমে যা সৃষ্টি বা গ্রহন করা হয় তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট । মানবীয় কর্ণ কখনও **Hiss Hiss** আওয়াজ সম্বলিত কোন শব্দ তরঙ্গ গ্রহন করে না যেমন নাকি **HI-FI** শব্দ গ্রহন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে । মানব জাতির সৃষ্টি থেকে অদ্যাবধি এটাই হয়ে আসছে ।

আজ পর্যন্ত মনুষ্য কর্তৃক কোন দর্শন যন্ত্র বা শব্দ গ্রহন যন্ত্র মানুষের চোখ ও কর্ণের মত দক্ষ, পূর্ণাঙ্গ ও সফল যন্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয় নাই ।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তর থেকে দেখে ও শুনে ঃ কোন্ সে জন

সে কোন জন যিনি মানব মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে মুগ্ধ হয়ে গান ও পাখির কল-কাকলি শোনেন ও গোলাপের গন্ধ নেন । মানুষের চোখের, কানের ও নাকের উদ্দীপনাসমূহ বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক **(Electro-chemical)** স্নায়ু তরঙ্গ হিসাবে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে । জীব বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন ও শরীরবৃত্ত বিষয়ক পুস্তকে মানব মস্তিষ্কে কিভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পেতে পারেন । কিন্তু আপনি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির কোন উল্লেখই পাবেন না, তাহলো কোন সে জন যিনি মানব মস্তিষ্কে কখনও প্রতিবিম্ব বা ছবি, শব্দ, গন্ধ সম্বলিত **Electro-chemical** তরঙ্গ হিসাবে উপলদ্ধি করেন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন । সেখানেই রয়েছে সেই গুমহা চেতনাঞ্জ যা চক্ষু, কর্ণ ও নাকের কোন প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সব কিছু নির্ভুলভাবে উপলদ্ধি বা বুঝতে সক্ষম । এই মহা চেতনার মালিক কে ? এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে, এটা ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার নয়। চর্বির পুরু স্তর ও নিউরনের সমষ্টি দিয়ে গঠিত মস্তিষ্ক । এ কারণেই বাস্তববাদী ডারউইনবাদী যারা বিশ্বাস করে সবকিছুই বস্তুর দ্বারা গঠিত, তারা এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

এই মহা চেতনা হচ্ছে আল্লাহতালা কর্তৃক সৃষ্ট আত্মা । এই আত্মার দেখা, শুনা ও গন্ধ অনুভব করার জন্য চোখ, কান বা নাকের কোন প্রয়োজন হয়না । উপরন্তু চিন্তা করার জন্য এই আত্মার কোন মস্তিষ্কেরও দরকার হয় না।

যিনিই এই সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ সম্পর্কে পাঠ করবেন, তারা মহান আল্লাহ রাব্বিল আল আমিন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষনা করবেন তাঁকে ভয় করবেন । তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, সর্বোপরি শুধু তাকেই ভালবাসবেন । যিনি এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডকে গাঢ় অন্ধকার, কয়েক সেন্টিমিটার ক্ষুদ্র, ত্রিমাত্রিক, রঙ্গিন ছায়াঘন, আলোকজ্জ্বল কাঠামোর মধ্যে বন্দী বা সংকুচিত করে সৃষ্টি করেছেন।

<u>একজন বস্তুবাদীর বিশ্বাস</u>

উপর্যুক্ত আলোচনা, পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা পর্যবেক্ষন করলাম যে, বিবর্তনবাদের তত্ত্ব খোলাখুলিভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তের সাথে সংঘর্ষশীল তথা ভুল বা ভিত্তিহীন । পৃথিবীতে প্রাণের উৎস সম্পর্কে এ মতবাদের দাবী বিজ্ঞানের বিচারে ভিত্তিহীন । প্রাণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে বিবর্তনবাদী পদ্ধতির দাবী এ মতবাদে করা হয়েছে তা বাস্তব সম্মত নয় । জীবাশ্ম রেকর্ড অনুযায়ী কোন অন্তবর্তীকালীন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই । এ কারণে বিবর্তনবাদ অবৈজ্ঞানিক হিসাবে দর্শন জগত থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত । প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক চিন্তাধারা বা মতবাদ বিজ্ঞানের জগত থেকে অপসারন করা হয়েছে বিবর্তনবাদ মডেলও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ।

বিবর্তনবাদকে দুর্ভাগ্যবশত বলপূর্বক বিজ্ঞান সম্মত হিসাবে চালানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, এমনকি কিছু সংখ্যক বিবর্তনবাদের সমালোচনাকে বিজ্ঞানের উপর আক্রমন হিসাবেও অভিহিত করে থাকেন । কিন্তু কেন? এর কারণ হচ্ছে কিছু সংখ্যক লোকের কাছে বিবর্তনবাদ একটি অপরিহার্য গোঁড়ামি যা প্রায় ধর্মীয় বিশ্বাসের মত কার্যকর । এসব মহল অত্যন্ত জোরেশোরে বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়ে ডারউইনবাদ দ্বারা প্রভাবিত এবং সৃষ্টি রহস্যের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা একমাত্র ডারউইনবাদের মাধ্যমেই করে থাকেন তারা প্রকাশ্যেই তা ঘোষনা করেন ।

হাভার্ড ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত **Geneticist Richard Lewontin** যিনি একজন বিবর্তনবাদী, তিনি নিজেকে প্রথমে একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ এবং পরে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন, তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক প্রথা বা পন্থা যাই হোক না কেন, আমরা অতি অবশ্যই আমাদের বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্যের অগ্রাাধিকার থাকার কারণে আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধান পদ্ধতি ও কিছু বস্তু তথা জড়বাদী মতবাদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা (বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) শুধু বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই প্রদান করবে, তা সে যত দুর্জ্ঞেয়, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বিরোধী বা সূত্র বিহীন হোক না কেন । তাছাড়া সেই বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা বা ভাবধারাই চূড়ান্ত, তাই আমরা এক্ষেত্রে কোন ঐশী বাণী বা মতবাদকে কোনক্রমেই গ্রহণ করতে পারিনা ।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ডারউইনবাদ যা অত্যন্ত গোঁড়া একটি মতবাদ বস্তুবাদী দর্শনকে জীবিত বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই মতবাদকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে । এই অন্ধ দর্শন বা মতবাদ বস্তু ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেনা । এ কারণেই এটা বিশ্বাস করা হয় যে, প্রাণ, চেতনা ও স্বত্তাবিহীন বস্তু পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করেছে । এ মতবাদ ধারনা করে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ প্রজাতি-পক্ষী, মাছ, জিরাফ, বাঘ, পোকা-মাকড়, বৃক্ষ, ফুল, তিমি এবং মানুষ সব কিছুই বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে-অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিপাত থেকে সৃষ্টি । এ ধরনের চিন্তাধারা বা ধারনা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিপরীত । অথচ ডারউইনবাদীরা এ মতবাদকে এখনও অন্ধের মত আঁকড়ে রেখেছেন কারণ তারা চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে কোন ঐশী বা আধিভৌতিক কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় ।

যদি কেহ বস্তুবাদী এক পেশে দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে পৃথিবীর প্রাণ জগতের দিকে খোলা মনে লক্ষ করেন, তিনি অতি অবশ্যই প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, জগতের সমস্ত প্রাণী সেই মহা শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়ের সৃষ্টি । তিনিই সেই স্রষ্টা যিনি শূন্য থেকে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছেন, যিনি প্রত্যেক প্রাণীর নকশা, আকার, আকৃতি, প্রকৃতি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন ।